শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক কেন ?

প্রথম ভাগ।

শ্রীনবকুমার দেবশর্ম্মা নিয়োগী কর্ত্তৃক

প্রণীত।



ঢাকা—জয়দেবপুর রাজবাড়ী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।



কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলা বঙ্গবা[illegible]ীম-মেসিন-প্রেসে

শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত।

১৩০৩ সাল

ভূমিকা।

আসিয়াছি একা, যাইবও একা। আমার বলিয়া, আমার চিহ্ন কিছুই থাকিবে না; থাকিবারও নয়। থাকিবে কেবল—ভগবানের মহিমা [illegible]। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেই মহিমা ও মাহাত্ম্যে যে সকল আবর্জ্জনা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, আমার মানস-সম্মার্জ্জনী কর্ত্তৃক সেই আবিলতা কিয়দংশেও দূরীভূত ও পরিষ্কৃত হইতে পারে কিনা, জীবনের শেষভাগে, তাহাই চিন্তা ও চেষ্টার বিষয়। জানি না, সেই কৃপানিধি ভগবানের অপার কৃপায়, এই আকাঙ্ক্ষার বিন্দুমাত্রও পুরোবর্ত্তী হইতে সমর্থ হইব কি না। তবে ভরসা, সেই ভগবান্, ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান আছেন। অতএব বিনীত প্রার্থনা, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ সদয় ও ন্যায়দৃষ্টিতে আমার এই আকাঙ্ক্ষার ফল গ্রহণ করিলেই চরিতার্থ হইব।

শ্রীনবকুমার দেবশর্ম্মা
নিয়োগী।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

খৃষ্টান মিশনরীগণ, তাঁহাদের স্বধর্ম্ম-প্রচার ও দলপুষ্টি মানসে হিন্দুর প্রাণ—হিন্দুর প্রাণের প্রাণ, অথবা হিন্দু-প্রাণের যথাসর্ব্বস্ব যে কৃষ্ণ-চরিত্রে লাম্পট্যাদি নানা দোষ উল্লেখে স্থানে স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছেন, অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত হিন্দু-সন্তানদিগের মন যাহা শ্রবণে কখনও বিচলিত, কখনও বা একবারেই ধর্ম্মচ্যুত হইয়া পড়িতেছে, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই কৃষ্ণ-চরিত্র অশেষ দোষের আকর কি না, তাহা প্রদর্শনার্থই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের অবতারণা।

কৃষ্ণ-চরিত্রে দোষ দেখাইবার পক্ষে খৃষ্টান মিশনরীদিগের একমাত্র অবলম্বন শ্রীমদ্ভাগবত। গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতে হিন্দুর আরাধ্য-ধন শ্রীকৃষ্ণকে শঠ, লম্পট, ধূর্ত্ত, চোর, পরস্ত্রী-অপহারক এবং আরও কতই কি বলিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। মিশনরীগণও সেই ধুয়া ধরিয়াই হাটে, মাঠে, ঘাটে, পথে, বাজারে, বন্দরে, সর্ব্বত্র গাইয়া বেড়াইতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ চোর, ধূর্ত্ত, শঠ, লম্পট ইত্যাদি। হিন্দুগণ বুঝিতে না পারিয়া—ভালমন্দ বিচার না করিয়া, অন্ধবিশ্বাসে তাঁহাদেরই পুরাণে লিখিত অমন শঠের গুরু, চোরের শিরোমণি, লম্পটের লম্পট, ধূর্ত্তের ধূর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ জ্ঞানে আরাধনা করে, ভক্তিযোগ সহকারে তাঁহারই শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দেয় এবং অন্তিমেও সেই পদেই লয় পাইবার আকাঙ্ক্ষা রাখে।" তাঁহারা যদি হিন্দুর শাস্ত্র দ্বারাই হিন্দুর উপাস্যদেবের অনন্ত দোষ প্রমাণিত করিতে পারেন, তবে তাহা শুনিয়া অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত হিন্দুর প্রাণ চমকিয়া যাইবে—তাহাতে ভক্তির পরিবর্ত্তে অভক্তির স্রোত বহিবে, ইহা বিচিত্র কি? জঘন্য-প্রকৃতিতে কে প্রাণ ঢালিয়া দেয়? তাহাকে ইষ্টজ্ঞানে আরাধনা করিতেই বা কাহার প্রবৃত্তি জন্মে? অতএব এক্ষণে দেখা আবশ্যক হইতেছে যে, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ, পুরাণ-লেখক, মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের লেখনী-প্রসূত, কি কৃষ্ণ-বিদ্বেষী অন্য কোনও আধুনিক লেখকের কপোল-কল্পিত? বিচারতঃ যদি উহা মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের লেখনী-প্রসূত বলিয়াই সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই; তখনই স্বীকার

করিতে হইবে যে, কৃষ্ণ-চরিত্র কলঙ্কের আবাসভূমি, শ্রীকৃষ্ণ নরকের কীটবিশেষ। আর যদি তাহা না হয়, তবে ঐ সকল কল্পিত নিন্দাবাদ শুনিয়া, যে সমস্ত হিন্দুর প্রাণ বিচলিত হইতেছে, অথবা একবারেই ধর্ম্মচ্যুত হইয়া পড়িতেছে; তাহাদের যে শেষগতি কি হইবে, তাহা সেই গতি-বিধাতা ভগবান্ই জানেন।

একে ত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচার অবধি উহার লেখক সম্বন্ধে লোকের বিষম সন্দেহ চলিয়া আসিতেছে, তাহার পর যদি তল্লিখিত কৃষ্ণ-চরিত্রের সঙ্গে মহাভারত এবং মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশের কৃষ্ণ-চরিত্রের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে এমন পাষণ্ড, এরূপ মূর্খ কে আছে, যে বিশ্বাস করিতে পারে, উভয় চরিত্র এক-লেখনী-প্রসূত—একই ছাঁচে ঢালা? মহাভারত এবং মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশের কৃষ্ণ সাধু, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক, অদ্বিতীয় বীরপুরুষ, ধর্ম্মরক্ষক, ধর্ম্মপালক এবং দুষ্ট-সংহারক। শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণ লম্পট, ধূর্ত্ত, চোর, পরস্ত্রী-অপহারক—মোটের উপরে অতি অপাত্র বা অপবিত্র। মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, যে তূলিকায় মহাভারত এবং হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তমরূপে—অমন সুন্দররূপে আঁকিয়াছেন, তিনিই আবার সেই তূলিকায় সেই শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমদ্ভাগবতে ওরূপ জঘন্য-আকৃতিতে আঁকিবেন, ইহা কি সম্ভবে? তাহা হইলে আর তাঁহার মহত্ত্ব রক্ষা পায় কিসে? তাই বলি, শ্রীমদ্ভাগবত কখনও মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের লেখনী-সম্ভূত বলিয়া বোধ হয় না;—উহা আধুনিক অন্য কোনও গ্রন্থকারের গ্রন্থ। তিনি উদ্দেশ্যমূলে ভগবানের নির্ম্মল যশ বর্ণনা করিতে গিয়া, কার্য্যতঃ তাঁহাকে লাম্পট্যাদি অশেষ নীচভূষণে সাজাইয়াছেন এবং গ্রন্থের গৌরববৃদ্ধি জন্য উহাতে মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের নাম সংযোগ করিয়া দিয়াছেন।

মহাত্মা-কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-প্রণীত অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ভাগবত নামে যে পঞ্চম পুরাণ খানি রহিয়াছে, এই শ্রীমদ্ভাগবত সেই ভাগবত কি না, অথবা ইহা পুরাণ-বহির্ভূত, তাঁহারই হস্তলিখিত কোন ধর্ম্মগ্রন্থ, তাহারও বিচার করা সঙ্গত হইতেছে। যদি ইহা মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের নামে কৃত্রিম বলিয়াই স্থির হয় এবং ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে নিঃসংশয়ে মহাভারত এবং হরিবংশের কৃষ্ণ-চরিত্রের পবিত্রতা যে সর্ব্বাংশে

পরিরক্ষিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি ? কিন্তু বিষয়ের বিশেষ গুরুত্ব এবং আমার অতি অক্ষমতা, এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টি করিতে গেলে, উদ্দেশ্য-সাফল্যের পক্ষে গভীর সন্দেহ। তার পর শ্রীমদ্ভাগবতে চিরগ্রথিত থাকাতে ভগবানের যে সমস্ত কুৎসা দীর্ঘকাল যাবৎ সাধারণের চিত্তপটে বজ্রাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে ; আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর ব্যক্তির ক্ষুদ্র সিদ্ধান্তে তাহা যে সহজে কাহারও অন্তঃকরণ হইতে অপসারিত হইবে, এরূপ আশা করাও মূর্খতার পরিচায়ক বৈ আর কি হইতে পারে ? তবে যিনি বিশ্বাত্মা ভগবান্, তাঁহারই মহৎ যশঃ রক্ষার্থে যত্ন করা যে অতীব উচ্চতর কর্ত্তব্য, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই আমি এই অসম সাহসিকের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। আমা দ্বারা যদি ভগবানের মাহাত্ম্য কিয়ৎ পরিমাণেও প্রকাশ পায় ও তাহা সাধারণের ন্যায়-চক্ষে নিপতিত হয়, তাহা হইলেই কৃতার্থম্মন্য হইব।

শ্রীনবকুমার দেবশর্ম্মা।
নিয়োগী।

সূচীপত্র।

শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক কেন?

প্রথম ভাগ।

গ্রন্থারম্ভ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মহর্ষি-কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-কৃত পুরাণ-সংখ্যার বচনে যে সমস্ত পুরাণের নাম আছে, তন্মধ্যে ভাগবত নামে পঞ্চম পুরাণ খানিই শ্রীমদ্ভাগবত কি না?

পুরাণ-সংখ্যার বচন—

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
তথান্যন্নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমম্॥
আগ্নেয়মষ্টমঞ্চৈব ভবিষ্যং নবমং স্মৃতম্।
দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং তথা॥
বারাহং দ্বাদশঞ্চৈব স্কান্দঞ্চৈব ত্রয়োদশম্।
চতুর্দ্দশং বামনকং কৌর্ম্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্॥
মাৎস্যঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্॥

এই পুরাণ-সংখ্যার বচনের তৃতীয় স্থানে যে বৈষ্ণব পুরাণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যাহা বিষ্ণুপুরাণ নামে বিখ্যাত, তাহা কখনও শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়া লক্ষিত হইতে পারে না। তবে ভাগবত নামে যে পঞ্চম পুরাণ খানি রহিয়াছে, উহা শ্রীমদ্ভাগবত কি না, একটুকু বিশেষ বিবেচ্য। আমার বিবেচনায় কিন্তু তাহাও সম্ভবপর নহে। কেননা, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, ইহার পরক্ষণে ভাগবতপুরাণ বলিলে, তাহা ভগবতী-সম্বন্ধীয় পুরাণ বলিয়া মনে

করাই একান্ত ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত। কারণ, যে স্থলে ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ রহিয়াছে, সে স্থলে শক্তিপুরাণ (ভগবতীপুরাণ) থাকিবে না, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। অতএব বলি, ভাগবতপুরাণ কদাপি শ্রীমদ্ভাগবত নহে ;— উহা ভগবতীপুরাণ। ভগবতী শব্দ + ষ্ণ প্রত্যয় করিয়াই ভাগবত পদ সিদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাই এই পঞ্চম পুরাণ। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম শ্লোকে আছে যে, পরাশর-নন্দন ভগবান্ ব্যাস অশেষ শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং বহুবিধ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না, ইত্যাদি। বহুবিধ পুরাণ শব্দে পুরাণ উপপুরাণ সমস্তই বুঝা যাইতেছে। কেননা, অশেষ শাস্ত্রাধ্যয়ন, তৎপরে বহুবিধ পুরাণ পরিসমাপ্ত করিয়া, অবশেষে শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করিয়াছেন ; সুতরাং উহা পুরাণ-উপপুরাণ-সংখ্যার যে অন্তর্নিবিষ্ট নয়, ইহা নিশ্চয় কথা। তাহা হইলেই বলিতে হইবে, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ উপপুরাণ ছাড়া স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ।

প্রকৃত পক্ষে ঐ শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস করিয়াছেন, কি তাঁহারই নামে অন্য কোন কবি কোন সম্প্রদায় গঠন অথবা পোষণ জন্য লিখিয়াছেন, ইহার বিচার হওয়া আবশ্যক। তাহাতে এই তর্ক উঠিত পারে যে, ব্যাসদেবের নামে কৃত্রিম করিতে হইলে ভাগবত পুরাণ নাম করিলেই যথেষ্ট হইতে পারিত। তাহা না করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র বলিয়া কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের নামে কৃত্রিম করিলেন কেন ? এই তর্কের মীমাংসা, শ্রীমদ্ভাগবত মহর্ষি-কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-কৃত কি না, ইহার বিচারে যে সমস্ত কথা উঠিবে, তাহারই মধ্যে প্রস্ফুটিত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে—

একদা মহর্ষি নারদ, পরাশর-নন্দন ব্যাস সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ম্লানমূর্ত্তি-দর্শনে তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি মহাভারতাদি প্রণয়ন করিয়াছ। কিন্তু তাহাতে ভগবানের নির্ম্মল যশ বর্ণনা কর নাই। অতএব ভগবানের গুণ বর্ণনা করিয়া আর একখানি গ্রন্থ রচনা কর।'

তাহাতেই ব্যাসদেব ঐ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ রচনা করিলেন। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত যে মহাভারত এবং মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশের পরবর্ত্তী গ্রন্থ, উহাতে মহাভারত কিংবা হরিবংশের কোনও একটি কথাও যে উদ্ধৃত হইবার কথা নহে, তাহা [illegible]পারিত। কেননা, মহাভারতে ও হরিবংশে যে সমস্ত

কাহিনী রহিয়াছে, তাহাতে ভগবানের নির্ম্মল যশ বর্ণনা হয় নাই ; তাই মহর্ষি নারদ ব্যাসদেবকে আর একখানি গ্রন্থ লিখিতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং মহাভারত-হরিবংশের কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত লিখিলে আর তাহাতে ভগবানের নির্ম্মল যশের বর্ণনা হয় কিরূপে ?

মহাভারত এবং মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশ যে ব্যাস-কৃত, তাহাতে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। সুতরাং মহাভারতে হরিবংশে যখন শ্রীকৃষ্ণ দেবকী-নন্দন বলিয়া প্রকাশ আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে যদি সেই শ্রীকৃষ্ণকে রোহিণী-গর্ভ-সম্ভূত দেখিতে পাই, অথবা মহাভারত-হরিবংশের উদ্ধৃত প্রস্তাবগুলিতে সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যয় দেখি, তথাপি কি সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাস-কৃত ? মহাভারতে হরিবংশে যে শ্রীকৃষ্ণকে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরক্ষক এবং ধর্ম্মপালক দেখিতে পাই, শ্রীমদ্ভাগবতে সেই শ্রীকৃষ্ণকে চোর, ধূর্ত্ত, লম্পট, পরস্ত্রী-অপহারক, মিথ্যাবাদী, অধার্ম্মিক দেখিয়াও কি বলা যাইবে যে, এতদ্দ্বারা ভগবানের নির্ম্মল যশ কীর্ত্তিত হইয়াছে ? এই গ্রন্থ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাস-প্রণীত ?

শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্যে এমন কথা নাই যে, মহাভারত ও হরিবংশের প্রস্তাবগুলি অতি বিপর্য্যয় রূপে উদ্ধৃত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত নাম দিলেই ভগবানের নির্ম্মল যশ প্রকাশিত হইবে। উদ্দেশ্যে তাহা নাই, সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত মহর্ষি-কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-কৃত কি না, সেই মহাত্মা-কৃত মহাভারত ও মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশের সহিত তাহার পরীক্ষা করা ও শ্রীমদ্ভাগবতের কথার সহিত বিচার করিয়া লওয়াই সর্ব্বথা সঙ্গত বোধ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে—
অশ্বত্থামার শিরোমণি-কর্ত্তন।

কুরু-পাণ্ডবীয় মহাসমরে উভয় পক্ষের বীরগণ স্বর্গারোহণ করিলে, ভীমসেন গদা-প্রহারে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করেন। তৎকালে অশ্বত্থামা, প্রভু দুর্য্যোধনের তুষ্টিসাধন জন্য নিশীথ সময়ে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীর নিদ্রাভিভূত পঞ্চশিশুর শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক তাহা দুর্য্যোধনের নিকট আনিয়া দিলেন কিন্তু দুর্য্যোধন তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। দ্রৌপদী পুত্রশোকে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন, ভদ্রে! আমি গাণ্ডীব-মুক্ত শর দ্বারা অশ্বত্থামার মস্তক ছিন্ন করিয়া এখনই তোমাকে আনিয়া দিতেছি। তুমি সেই মস্তকোপরি আরোহণপূর্ব্বক স্নান করিও, তাহা হইলেই তোমার পুত্র-শোক নিবারিত হইবে। তৎপরে অর্জ্জুন রথারোহণে অশ্বত্থামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। অশ্বত্থামা দূর হইতে অর্জ্জুনকে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন, মহাদেবের ভয়ে ব্রহ্মার ন্যায় পলায়নোদ্যত হইলেন এবং তাঁহার প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে অর্জ্জুন প্রাণনাশের আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারই উপদেশে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন। উভয় অস্ত্রের প্রভাবে একবারে সৃষ্টি-ধ্বংসের সম্ভাবনা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জ্জুন উভয় অস্ত্র সংহার করিলেন ও অশ্বত্থামাকে যজ্ঞীয় পশুর ন্যায় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া স্বীয় শিবিরামুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, পার্থ! এই অধম ব্রাহ্মণের শিরশ্ছেদন কর; ইহাঁকে জীবিত রাখা উচিত নহে। তুমি পাঞ্চালীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, ইহাঁর ছিন্ন মস্তক লইয়া তাঁহাকে দিবে, ইহা আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি। এ ব্যক্তি পাপিষ্ঠ, শীঘ্র ইহাকে বধ কর। এই পাপিষ্ঠ কেবল যে আমাদিগের অপকার করিয়াছে, এমন নহে, দুর্য্যোধনেরও মহান্ অপকার করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মার্থ প্রদর্শন পূর্ব্বক এবম্ভূত প্রকারে বারংবার প্রবৃত্তি জন্মাইলেও অর্জ্জুন পুত্রঘাতী অশ্বত্থামার প্রাণ বিনাশ করিলেন না। তাঁহাকে লইয়া পাঞ্চালীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। তখন সুশোভনা দ্রৌপদী গুরু-পুত্রকে

পশুর ন্যায় রজ্জু-বদ্ধ দেখিয়া সদয়হৃদয়ে তাঁহার চরণে প্রণতা হইলেন এবং তাঁহার রজ্জু-বন্ধনে অসহ্য কষ্ট জ্ঞান করিয়া ভর্ত্তাকে কহিলেন, নাথ! এই ব্রাহ্মণকে বন্ধন-মুক্ত করুন। ইনি আমাদিগের গুরু, যাঁহার নিকটে আপনি গূঢ়মন্ত্র, বাণ-ত্যাগ, বাণ-সংহারের কৌশল এবং ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ দ্রোণ এই পুত্ররূপে সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন। ইহাঁর পূজা ও বন্দনা করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। দ্রৌপদীর এবংবিধ বাক্য শুনিয়া অন্যের কথা দূরং গচ্ছতু, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ভীমকে নিবারণ করিলেন ও সান্ত্ব-বাক্যে অর্জ্জুনকে কহিলেন, ব্রাহ্মণ অবধ্য জাতি, দ্রৌপদী ভালই বলিয়াছেন। তখন অর্জ্জুন কৃষ্ণের অভিপ্রায় বুঝিয়া খড়্গ দ্বারা কেশের সহিত অশ্বত্থামার শিরোমণি ছেদন করিয়া রাখিলেন এবং বন্ধন মোচনপূর্ব্বক তাঁহাকে শিবির হইতে দূর করিয়া দিলেন। তাহার পর পাণ্ডু-পুত্রেরা মৃত পুত্রদিগের দাহাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন।

এই গেল শ্রীমদ্ভাগবতের কথা; এখন এ বিষয়ে কি রহিয়াছে, সংক্ষেপে তাহাও দেখান যাইতেছে।

মহাভরতের সৌপ্তিক পর্ব্বে এই প্রস্তাব সম্বন্ধে ব্যাসদেব যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে দুর্য্যোধনের তুষ্টি-সাধন জন্য অশ্বত্থামার গুরুতর ক্রোধের কথা নাই, নিদ্রাভিভূত দ্রৌপদীর পঞ্চ শিশুর শিরশ্ছেদন করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট আনিয়া দেওয়ার বিবরণ নাই, দুর্য্যোধন তজ্জন্য অসন্তুষ্টও হন নাই, দ্রৌপদীর রোদনে দুঃখিত অর্জ্জুন কখনই তাঁহাকে এমন কথা বলেন নাই যে, আমি অশ্বত্থামার শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক তোমাকে মুণ্ড আনিয়া দিতেছি, তুমি তদুপরি আরোহণ করিয়া স্নান ও তাহাতে মলমূত্র ত্যাগ করিলে শোকের শান্তি হইবে। তাহার পর অর্জ্জুন কখনও দ্রৌপদীর শোকে বিচলিত হন নাই, অশ্বত্থামার শিরশ্ছেদন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন নাই, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হন নাই, অস্ত্রবেগ নিবারণ করেন নাই, তাঁহাকে রজ্জুতে বাঁধেন নাই, শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামার শিরশ্ছেদন কিংবা তাঁহাকে বধ করিবার জন্য অর্জ্জুনকে অনুমতি দেন নাই, শ্রীকৃষ্ণের কথা উপেক্ষা করিয়া বন্ধনাবস্থায় অশ্বত্থামাকে পাণ্ডব-শিবিরে আনয়ন, দ্রৌপদীর হস্তে সমর্পণ, অতঃপর ছাড়িয়া দেওয়ার

কথা নাই, শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে প্রশংসা করেন নাই, খড়্গ দ্বারা কেশের সহিত অশ্বত্থামার শিরোমণি কর্ত্তনপূর্ব্বক বন্ধন-মোচন-অন্তে তাঁহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণের অমূলক কথা নাই এবং কৃষ্ণের সাক্ষাতে পাণ্ডবদিগের অসদ্ভাব নাই।

মহাভারতে আছে, পাণ্ডবগণ অন্যায় অভিসন্ধি-মূলে কতিপয় বীর, বিশেষতঃ দ্রোণাচার্য্যকে নিহত করাতে ক্রোধোন্মত্ত অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের নিষেধ না শুনিয়া রাত্রিযোগে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রথমে পিতৃঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্নের শয়নাগারে উপনীত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ ও সংহার করিলেন। তাহার পর ক্রন্দন ও কোলাহল শ্রবণে বহুসংখ্যক সৈন্য ও বীরগণ জাগরিত হইয়া বর্ম্ম-ধারণে অশ্বত্থামাকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামাও অস্ত্র দ্বারা তাহাদিগের প্রাণ সংহার-পূর্ব্বক অনতিদূরে উত্তমৌজাকে আক্রমণ ও হত্যা করিলেন। তদ্দর্শনে যুধামন্যু অশ্বত্থামার হৃদয়ে গদা প্রহার করাতে, অশ্বত্থামা ধাবিত হইয়া তাঁহাকে পশুর ন্যায় বধ করিলেন। সংগ্রামের কোলাহলে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র জাগরিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে অশ্বত্থামাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন এবং মহাবীর শিখণ্ডী ও প্রভদ্রকগণ নিশিত শর দ্বারা তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন অশ্বত্থামা সিংহ-নাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সক্রোধ-লোচনে খড়্গ গ্রহণ করত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বাগ্রে দ্রৌপদীর পুত্রগণের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং খড়্গাঘাতে প্রতিবিন্ধ্যের কুক্ষিদেশ ছেদন করিলেন। সেই সময়ে প্রবল-প্রতাপশালী সুতসোম অশ্বত্থামাকে প্রাস অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অসি উত্তোলন-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। অশ্বত্থামা সুতসোমের সেই অসিযুক্ত বাহু ছেদন করিয়া পুনরায় তাঁহার পার্শ্বদেশে আঘাত করিলেন, তাহাতে তিনি ভিন্ন-হৃদয় হইয়া পতিত হইলেন। নকুলনন্দন বীর্য্যবান্ শতানীক অশ্বত্থামার হৃদয়ে রথচক্র নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামা শতানীককে ভূমিতলে নিপাতিত ও তাঁহার মস্তক হরণ করিলেন। অনন্তর শ্রুতকর্ম্মা পরিঘ গ্রহণে দ্রোণপুত্রের অভিমুখে গমনপূর্ব্বক তাঁহার বামভাগে তাড়না করিলেন। তখন অশ্বত্থামা ক্রোধবশে খড়্গ দ্বারা শ্রুতকর্ম্মার আস্যদেশে এমন আঘাত করিলেন যে, যাহাতে তিনি বিকৃতানন ও ক্ষত-বিক্ষত হইয়া হত ও

ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। ঐ সময়ে বীরবর শ্রুতকীর্ত্তি অশ্বত্থামার সমীপস্থ হইয়া নিরন্তর শরবর্ষণ করাতে তিনি চর্ম্ম দ্বারা তাহা নিবারণ ও শ্রুতকীর্ত্তির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অতঃপর ভীষ্ম-নিহন্তা শিখণ্ডী প্রভদ্রকগণের সহিত সমবেত হইয়া দ্রোণপুত্রকে বহুবিধ অস্ত্রে নিপীড়িত ও এক অস্ত্র তাঁহার ললাটদেশে নিক্ষেপ করিলে, ক্রোধাক্রান্ত অশ্বত্থামা খড়্গাঘাতে শিখণ্ডী, প্রভদ্রকগণ, বিরাট রাজার হতাবশিষ্ট সৈন্য সকল, দ্রুপদ রাজার পুত্র পৌত্র সুহৃৎ প্রভৃতি এবং অন্যান্য বীরগণকে ধরাতলশায়ী করিলেন। তিনি এইরূপে বহুসংখ্যক মনুষ্যের প্রাণ-সংহার করিয়া শিবির হইতে বহির্গত হইলেন এবং দ্বারদেশে যাইয়া কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সঙ্গে মিলিলেন। তখন তাঁহারা মনে করিলেন, যদি কুরুরাজ দুর্য্যোধন জীবিত রহিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে এই সংবাদ দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই বলিয়া তাঁহারা রণে নিপতিত দুর্য্যোধনের সমীপে গমন করিলেন এবং কুরুরাজের প্রাণ যাওয়ার উপক্রম দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আপনি স্বর্গে যাইয়া আমার পিতা আচার্য্যকে বলিবেন, অশ্বত্থামা পিতৃ-নিহন্তা-ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট করিয়াছে। তিনি আরও কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডব-পক্ষে পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এই সাতজন এবং কৌরব পক্ষে আমরা তিন জন, উভয় পক্ষে এই দশজন মাত্র জীবিত আছি। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণ, পাঞ্চালগণ এবং হতাবশিষ্ট মৎস্য-দেশীয়েরা সকলেই নিহত হইয়াছে। রাজা দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার মুখে এই শ্রুতিসুখাবহ বাক্য শ্রবণে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, হে বীর! মহাবাহু ভীষ্ম, কর্ণ ও আপনার পিতা দ্রোণাচার্য্য যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন নাই, আপনি কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত সমবেত হইয়া সেই কর্ম্ম সংসাধন করিয়াছেন, নীচাশয় পাণ্ডব-সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীর সহিত বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিয়া আমি আপনাকে ইন্দ্রের সমান জ্ঞান করি। আপনারা কল্যাণ লাভ করুন, স্বর্গে পুনরায় আপনাদিগের সহিত আমার মিলন হইবে। এই কথার পর ঐ তিন বীরকে আলিঙ্গন করিয়া দুর্য্যোধন কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা তিনজনে শোক-সন্তপ্তচিত্তে প্রত্যূষ সময়ে নগরাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

প্রভাত সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথির মুখে রাত্রির সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া একান্ত শোকাকুলিত ও ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন সাত্যকি, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলে, তিনি অনেক কষ্টে চৈতন্য লাভ করিয়া নকুলকে বলিলেন, তুমি শীঘ্র যাইয়া মন্দভাগিনী দ্রৌপদীকে তাঁহার মাতৃকুলের সহিত এই স্থানে আনয়ন কর। আদেশানুসারে নকুল রথারোহণে গমন করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক পুত্রাদির শব দর্শনে বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে নকুল দ্রৌপদী প্রভৃতিকে লইয়া উপনীত হইলে, দ্রৌপদী রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া পুত্রশোকে ধরাতলে নিপতিতা হইলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ধর্ম্মরাজ! আপনি পুত্রদিগকে মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত করিয়া কি সুখে রাজ্যভোগ করিবেন? আপনি যদি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে পাপ-কর্ম্মা অশ্বত্থামাকে বিনষ্ট না করেন, তবে আমি এই স্থানেই প্রায়োপবেশন করিব। এই কথা শ্রবণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শান্তিপূর্ণ বাক্যে তাঁহাকে নানারূপ ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি পুনরপি বলিলেন, মহারাজ! আমি শুনিয়াছি, দ্রোণপুত্রের মস্তকে এক স্বভাবসিদ্ধ মণি আছে, সেই পাপাত্মাকে সমরে নিহত করিয়া সেই মণি আনয়ন করিলে আমি তাহা দেখিতে পাইব এবং তাহা আপনার মস্তকে রাখিয়া জীবিত থাকিব, ইহাই আমার নিশ্চয় হইয়াছে।

চারুদর্শনা দ্রৌপদী রাজাকে এইরূপ বাক্য বলিয়া ভীমসেনের সম্মুখে আসিয়া কহিতে লাগিলেন, নাথ! ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক আমাকে পরিত্রাণ কর। তুমি পূর্ব্বে ভ্রাতৃগণ-সহ আমাকে রক্ষা করিয়াছ, কীচককে সংহার করিয়া আমাকে মুক্ত করিয়াছ। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন শম্বরাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও সমরে অশ্বত্থামাকে নিহত কর। এই কথা কহিয়া দ্রৌপদী বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে ভীমসেন নকুলকে সারথির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, রথারোহণে অশ্বত্থামার বিনাশ-বাসনায় তাঁহার রথ-চক্রের চিহ্ন অনুসরণ ক্রমে তাঁহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আপনার ভ্রাতা বৃকোদর পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া দ্রোণপুত্রকে সংহার করার মানসে একাকীই

গমন করিতেছেন। অন্যান্য ভ্রাতৃগণ আপেক্ষা ভীমের উপর আপনার স্নেহ অত্যধিক, ইহা আমি জানি। তবে আপনি তাঁহাকে বিপৎসাগরে পতনোন্মুখ দেখিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন ? দ্রোণাচার্য্য তাঁহার পুত্রকে ব্রহ্মশির নামে যে অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, সেই অস্ত্রে সমুদয় পৃথিবী দগ্ধ করিতে পারে। উহার সংহারে সক্ষম একমাত্র পার্থ। ইত্যাদি বহুকথা কহিয়া, তিনি যুধিষ্টির ও অর্জ্জুনের সহিত রথারোহণে ভীমের পাছে পাছে গমন করিলেন এবং ভাগীরথী-তীরে যাইয়া সকলেই উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখিলেন, মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন অন্যান্য ঋষিগণের সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং তাঁহার নিকটেই সেই ক্রূরকর্ম্মা ঘৃতাক্ত কুশচীরধারী ধূলিধ্বস্ত অশ্বত্থামা আসীন আছে। ভীমসেন তাহাকে দেখিবামত্র শর সহ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন এবং 'থাক্ থাক্' এই কথা বলিলেন। অশ্বত্থামা ভীমপরাক্রম ভীমসেন, তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় এবং জনার্দ্দনকে দেখিয়া পুনরায় সংগ্রাম উপস্থিত হইল বিবেচনায় পাণ্ডববংশ ধ্বংস জন্য ব্রহ্মশির অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশানুসারে অর্জ্জুন, অশ্বত্থামার অস্ত্র সংহার হউক বলিয়া দ্রোণাচার্য্য-প্রদত্ত দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করাতে, উভয় অস্ত্রের তেজে সসাগরা বসুন্ধরা বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর দেবর্ষি নারদ এবং ভারতকুলের পিতামহ ব্যাসদেব ঐ দিব্যাস্ত্রদ্বয়ের তেজঃপ্রভাবে সর্ব্বলোক সন্তাপিত অবলোকন করিয়া অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, পূর্ব্বকালে বিবিধাস্ত্রবেত্তা অনেক মহারথ ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কখনও মানবের প্রতি এরূপ দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই। এক্ষণে আপনারা এই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছেন। তখন অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি অশ্বত্থামার অস্ত্রবেগ নিবারণার্থই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। এখন ইহার প্রতিসংহার করিলে, অশ্বত্থামার অস্ত্রপ্রভাবে আমাদিগের সকলকেই ভস্মসাৎ হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব যাহাতে আমাদের ও লোক সকলের মঙ্গল হইতে পারে, আপনারা তাহার মন্ত্রণা করুন। মহাবীর অর্জ্জুন সত্যব্রতধর, শূর, ব্রহ্মচারী এবং গুরু-আজ্ঞানুবর্ত্তী ; এই কারণেই সেই অস্ত্র পুনর্ব্বার সংহার করিলেন। কিন্তু দ্রোণনন্দন কোনক্রমেই স্বীয় দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি অতি দীনভাবে দ্বৈপায়নকে কহিলেন,

হে মুনে ! আমি ভীমের ভয়ে বিপদাপন্ন হইয়া এই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। পৃথিবীকে পাণ্ডব-শূন্য করাই আমার অভিপ্রেত ছিল। এক্ষণে কিন্তু আমি উহা প্রতিসংহার করিতে সক্ষম হইতেছি না। সুতরাং ক্রোধোন্মত্ততা-হেতু পাপানুষ্ঠান হইলেও উহা পাণ্ডবগণকে সংহার করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তখন ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস অর্জ্জুন ব্রহ্মশির অস্ত্র অবগত থাকিয়াও কোনক্রমে তোমার বিনাশার্থ উহা ত্যাগ করেন নাই; কেবল তোমার অস্ত্রনিবারণার্থই ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। মহাবীর ধনঞ্জয় ধৈর্য্যাবলম্বী, সাধু, সর্ব্ব-শাস্ত্রবিশারদ ; তুমি কিজন্য সভ্রাতৃক তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে অভিলাষ করিয়াছ ? তুমি সত্বর দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার কর, ক্রোধশূন্য হও, পাণ্ডবগণ নিরাপদ হউক। রাজা যুধিষ্ঠির অধর্ম্মানুষ্ঠান-পূর্ব্বক জয়লাভের বাসনা করেন না। এক্ষণে তোমার মস্তকস্থিত মণি পাণ্ডবদিগকে প্রদান কর ; ইত্যাদি।

সেই সময়ে অশ্বত্থামা বলিলেন, হে মুনে ! পাণ্ডব ও কৌরবগণের যে সমস্ত ধনরত্ন বিদ্যমান আছে, সেই সমস্ত অপেক্ষা আমার এই মণি অতিবড় শ্রেষ্ঠ। ইহা ধারণ করিলে অস্ত্র-ভয়, ব্যাধি-ভয় এবং ক্ষুধা, একবারেই তিরোহিত হয়,—কোন শঙ্কাই থাকে না। অতএব কোন প্রকারেই এই মণি আমার ত্যাজ্য হইতে পারে না। মণি এবং আমি উভয়েই উপস্থিত, আপনার যাহা ইচ্ছা করুন। পরন্তু এই অমোঘ ঐষিক অস্ত্র পাণ্ডব-পুত্রগণের মহিলাদিগের গর্ভস্থিত সন্তানের উপর নিপতিত হইবে, আমি কোন প্রকারেই তাহার প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হইব না। ব্যাসদেব কহিলেন, হে অনঘ ! তুমি অন্য প্রকার বুদ্ধি করিও না, গর্ভে ইহা পরিত্যাগ করিয়া উপরত হও।

অনন্তর বাসুদেব, অশ্বত্থামা কর্তৃক গর্ভ-উদ্দেশে সেই অস্ত্র পরিত্যক্ত হইল জানিয়া, হৃষ্টচিত্তে দ্রোণনন্দকে বলিলেন, পূর্ব্বে বিরাট নগরে এক ব্রাহ্মণ বিরাট-রাজ-তনয়া উত্তরাকে কহিয়াছিলেন, কৌরব-বংশ উচ্ছিন্ন-প্রায় হইলে তোমার গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। কৌরববংশের পরিক্ষীণাবস্থায় ঐ পুত্রের জন্ম হইবে বলিয়া তাহার নাম পরিক্ষিৎ থাকিবে। হে আচার্য্যকুমার ! সাধু-ব্রাহ্মণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা কখনই অন্যথা হইবার নহে। অতএব পরীক্ষিৎ নামে পাণ্ডবগণের বংশরক্ষাকর এক সন্তান হইবে, সন্দেহ নাই।

ইহার উত্তরে অশ্বত্থামা বলিলেন, হে বাসুদেব! আপনার বাক্য সফল হইবে না; আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই ঘটিবে। আপনি বিরাট-রাজ-দুহিতার গর্ভ রক্ষার অভিলাষ করিতেছেন, কিন্তু আমার অস্ত্র সত্বরেই তাহাতে নিপতিত হইবে।

কৃষ্ণ কহিলেন, তোমার ঐ অস্ত্র অন্যথা হইবার নহে সত্য বটে, কিন্তু উহাতে গর্ভস্থিত বালক নিহত ও পুনরায় জীবিত হইয়া দীর্ঘ কাল এই বসুন্ধরাকে অধিকার করিয়া থাকিবে। হে দ্রোণতনয়! মনীষিগণ তোমাকে পাপাত্মা কাপুরুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত আছেন। তুমি বালক-নিহন্তা, অতএব নিশ্চয়ই এইক্ষণেই এই পাপ কর্ম্মের ফলভোগ করিবে। তোমাকে সহায়-বিহীন হইয়া তিন সহস্র বৎসর মৌনভাবে নির্জ্জন প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে হইবে; কোনক্রমেই লোকালয়ে অবস্থিত হইতে পারিবে না। তুমি পূয়শোণিত-গন্ধ এবং সমস্ত ব্যাধি-সমন্বিত হইয়া দুর্গম অরণ্য আশ্রয় করত বিচরণ করিবে। আর পরীক্ষিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃপাচার্য্যের নিকট সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র শিক্ষা করিয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে ষষ্টিবৎসর কাল এই ভূমণ্ডল পালন করিবেন। তুমি এইক্ষণে তাঁহাকে অস্ত্রবলে দগ্ধ করিলেও আমি তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিব।

সেই সময়ে ব্যাসদেবও কহিলেন, হে আচার্য্যকুমার! তুমি যখন আমাদিগের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক এই নিদারুণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে এবং ব্রাহ্মণ হইয়াও যখন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বনে কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তখন হৃষীকেশ যাহা বলিতেছেন, তাহাই ঘটিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অশ্বত্থামা উত্তর করিলেন, তপোধন! আমি এই জীবলোকে আপনারই সহিত অবস্থিতি করিব। আপনি এবং বাসুদেব সত্যবাদী হউন। তিনি এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণকে সেই মণি প্রদানপূর্ব্বক বিষণ্ন মনে অরণ্যে গমন করিলেন। পাণ্ডবগণ মণি গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস ও নারদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক বাসুদেবের সহিত অবিলম্বে রথারোহণে দ্রৌপদীর সন্নিধানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা কিয়ৎকাল মধ্যে শিবিরে পঁহুছিয়া শোক-সন্তপ্তা দ্রৌপদীর সমীপে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী কহিয়া, ভীমসেন অশ্বত্থামার শিরোমণি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। দ্রৌপদী মণি গ্রহণ

করিয়া কহিলেন, অশ্বত্থামা আমাদিগের গুরুপুত্র। তিনি যে মণি মস্তকে ধারণ করিতেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ সেই মণি স্বীয় মস্তকে ধারণ করুন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর অনুরোধে গুরুর উচ্ছিষ্ট বলিয়া মস্তকে মণি ধারণ করিলেন এবং তাহাতে অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে পুত্র-শোকাতুরা দ্রৌপদী সত্বরে গাত্রোত্থান করিলেন। ইত্যাদি।

এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে ও শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে কত প্রভেদ !! অথবা উহা একবারেই বিপরীত সম্পর্কে সম্পর্কিত কি না? মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রেয়, ধার্ম্মিক ; তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকলই জানিতেন এবং তদনুসারে পাণ্ডবদিগকে পরিচালিত করিতেন। পাণ্ডবেরাও কৃষ্ণগত-প্রাণ—কৃষ্ণার্জ্জুনের এক আত্মা। কৃষ্ণ যাহা কহিতেন, পাণ্ডবগণ অবনতশিরে তাহা সম্পন্ন করিতেন। যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই কৃষ্ণ। পাণ্ডবেরা ধার্ম্মিক বলিয়াই ভগবান্ সখারূপে সতত তাঁহাদের সন্নিহিত রহিয়াছেন। অর্জ্জুন ঘোরতর আপদ-বিপদে নিপতিত হইলেও কখন তাহাতে বিচলিত হন নাই এবং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে উপেক্ষা করেন নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতকার কৃষ্ণার্জ্জুনের সেই সকল পবিত্র সদ্‌গুণগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়া লিখিয়াছেন, অর্জ্জুন যখন অশ্বত্থামাকে রজ্জুবদ্ধ করিলেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কহিলেন, 'এই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণের শিরশ্ছেদন কর। আমি জানি, ইহা করিতে তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ। এই অধম ব্রাহ্মণকে বধ করিলে কোন পাপ নাই'। আবার দ্রৌপদী যখন কহিলেন, অশ্বত্থামা গুরু-পুত্র, শীঘ্র ইহাঁকে ছাড়িয়া দেও। কৃষ্ণও তখন বলিয়া উঠিলেন, 'দ্রৌপদী ভাল বলিয়াছেন, অশ্বত্থামা কদাপি বধযোগ্য হইতে পারে না। ইহাঁকে বধ করিলে মহাপাপ জন্মিবে'। তাহার পর মহাভারতে যে অর্জ্জুন অবিচলিতচিত্ত, সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ, স্থির-প্রতিজ্ঞ এবং কৃষ্ণগত-প্রাণ, শ্রীমদ্ভাগবত-লেখক সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন অর্জ্জুন দ্বারা দ্রৌপদীর শোক-শান্তির জন্য গুরু-পুত্র অশ্বত্থামার শিরশ্ছেদন, তদুপরি তাঁহার স্নান ও মল-মূত্রত্যাগের ব্যবস্থা করাইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে উপেক্ষা দেখাইয়াছেন, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও গুরুপুত্রের কেশের সহিত শিরোমণি কর্ত্তন করাইয়াছেন এবং তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের পাপে পাপী বানাইয়াছেন।

মহাভারতে ব্যাসদেব যে কৃষ্ণার্জ্জুনকে বিবিধ গুণরত্নে ভূষিত করিয়াছেন, যাঁহাদিগের একাত্মতা-বর্ণনায় নরনারায়ণ বলিয়া বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন, যে কৃষ্ণের উপদেশের জন্য পাণ্ডবগণকে লালায়িত হইয়া আদেশ পালন করিতে দেখাইয়াছেন এবং যে অর্জ্জুনকে ব্রত-পরায়ণ, সত্যধর্ম্ম-নিরত ও গুরুশুশ্রূষা-তৎপর বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে সেই কৃষ্ণার্জ্জুনের বিবিধ গুণরত্ন কাড়িয়া লইয়া—তাঁহাদিগকে পাপপঙ্কে ডুবাইয়া দিয়া—কৃষ্ণার্জ্জুনের একাত্মতা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন এবং পাণ্ডবদিগকে স্বেচ্ছাচারী বানাইয়াছেন, একথা কিছুতে সম্ভবপর নহে। ইহাই কি প্রভুর নির্ম্মল যশ, না কৃষ্ণার্জ্জুনের অপরিসীম কুৎসা ? কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন মহাভারতে যেরূপ যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত লিখিতে কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন ? যে ব্যাসদেব গঙ্গাতীরে বসিয়া স্বয়ং মধ্যবর্ত্তী হইয়া শান্তিস্থাপন জন্য অশ্বত্থামার মস্তকস্থিত মণি, তাঁহারই দ্বারা পাণ্ডবদিগকে দেওয়াইয়াছেন, সেই মহাত্মা স্বকৃত কর্ম্ম ও স্বকৃত রচনা উল্টাইয়া দিয়া, মহাভারতের বিপর্য্যয়ে শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়াছেন ও মহাভারতরূপ স্বকীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ ধ্বংস করিয়াছেন, ইহাও কি হইতে পারে ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে—
যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রাপ্তি।

এই গ্রন্থে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রাপ্তি, ভীষ্মদেবের প্রাণত্যাগ এবং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-গমন যেরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, মহাভারতে কিন্তু সেইরূপ লিখিত হয় নাই। তৎসম্পর্কে ৩।৪টী কথা দেখান যাইতেছে।

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যগ্রহণের পর বাসুদেব ও অর্জ্জুন পরম পরিতুষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল পরিভ্রমণ-অন্তে ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া উপনীত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা-গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিলেন, মহাত্মন্! আপনি রণস্থলে যে সকল যোগ-ধর্ম্ম কহিয়াছিলেন, তাহাও শুনিয়াছি এবং আপনার বিশ্ব-মূর্ত্তিও দেখিয়াছি। কিন্তু যাহা শুনিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না। অতএব পুনরপি যোগ-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মতত্ত্ব-কীর্ত্তনে অর্জ্জুনকে কৃতার্থ করিলেন। উহাই উত্তর-গীতা বলিয়া কথিত হইয়াছে।

সেই দিবসই তাঁহারা হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া, বাসুদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট দ্বারকা-গমনের অভিপ্রায় জানাইলেন। তখন অশ্বমেধ যজ্ঞের পূর্ব্বে পুনরায় আসিতে অনুরোধ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বিদায় দিলেন, তিনিও অর্জ্জুনের সঙ্গে একত্র-বাসে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পর-দিবস যুধিষ্ঠির ও পিতৃষসা কুন্তীর অনুমতি অনুসারে সুভদ্রাকে রথে আরোহণ করাইয়া হস্তিনাপুর হইতে বিনির্গত হইলেন। কপিধ্বজ, সাত্যকি, মাদ্রবতী-সুত নকুল সহদেব, আগধ-বুদ্ধি বিদুর এবং গজরাজ-বিক্রম ভীম তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ভীমাদি ও বিদুরকে নিবর্ত্তিত করিয়া দারুক ও সাত্যকিকে সত্বর অশ্বচালন করিতে আদেশ দিলেন।

ইহাতে স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে যে, মহাভারতের লেখানুসারে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-প্রাপ্তির পর শ্রীকৃষ্ণ একদিনমাত্র হস্তিনায় অবস্থান করিয়াছিলেন, দ্বারকায় যাওয়ার কালে তিনি সুভদ্রা, সাত্যকি, দারুককে সঙ্গে নিয়াছিলেন এবং ভীম, নকুল, সহদেব, বিদুরও কতকদূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগামী

হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে কিন্তু অন্যরূপ। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থানের কাল চারি মাস; এই প্রসঙ্গে বিদুরের ত নামগন্ধই নাই, তাহার পর সুভদ্রাকে সঙ্গে নেওয়ারও কোন কথা নাই—কেবল লিখিত আছে, উদ্ধব ও সাত্যকিকে সঙ্গে নেওয়ার কথা।

মহাভারতে ভীষ্মদেবের ইচ্ছা-মৃত্যু। তিনি শর-শয্যায় শয়ান থাকিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে অশেষ ধর্ম্মোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক যখন প্রাণত্যাগ করিবার অভিলাষে যোগাবলম্বন করিলেন, তখনই তাঁহার গাত্র-বিদ্ধ অস্ত্র সকল খসিয়া পড়িল, মস্তক হইতে মহোল্কার ন্যায় কোন পদার্থ নিঃসৃত হইয়া আকাশে প্রবেশ করত ক্ষণকাল মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এস্থলে শ্রীমদ্ভাগবতকার লিখিয়াছেন, গাত্র-বিদ্ধ অস্ত্রের পীড়নে ভীষ্মদেবের মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইত্যাদি।

উভয় গ্রন্থের এত বৈষম্য পাঠ করিয়াও কি কোন পাঠকের বলিতে প্রবৃত্তি হইবে যে, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত, একই লেখকের লেখা ?

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে—

অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রনিক্ষেপ।

দ্বারকা যাওয়ার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব ও সাত্যকিকে সঙ্গে লইয়া রথারূঢ় হইয়াছেন, এমন সময়ে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র উত্তরাব সম্মুখীন হইতেছে দেখিয়া, উত্তরা প্রাণভয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও চীৎকার-পূর্ব্বক হে জগন্নাথ! রক্ষা কর, রক্ষা কর, বলিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন। তখন ভগবান্ বিপদ দর্শনে বিরাট-তনয়ার গর্ভস্থিত সন্তান রক্ষার নিমিত্ত অতি সূক্ষ্মরূপে তাঁহার গর্ভ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং গর্ভস্থ শিশুকে আবৃত করিয়া রহিলেন। তখন ব্রহ্মাস্ত্র ঐ গর্ভে প্রবেশ-অন্তে ভগবানের শরীরে ঠেকিয়া প্রতিহত হইল।

পূর্ব্বে পাণ্ডুপুত্রদিগের বিনাশ জন্য অশ্বত্থামা যখন ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতকার কিন্তু তখন বাসুদেবের চক্র দ্বারা সেই অস্ত্র সংহার-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে রক্ষা করাইয়াছেন। এক্ষণে পুনরপি তাহারই প্রয়োগে ভগবান্ দ্বারা চক্রের পরিচালনা না করাইয়া, স্বয়ং তাঁহাকে গর্ভস্থ শিশুরক্ষার্থ উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করাইলেন। যে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় জগতে না হইতে পারে, এমন কর্ম্ম নাই, একটা অস্ত্র দমন জন্য সেই ইচ্ছাময়

ভাগিনেয়-বধূ উত্তরার গর্ভে স্বয়ং প্রবেশ করিলেন। ইহা অস্বাভাবিকের মত বোধ হয় না কি? ইহাতে ভগবানের অযশ বই যশই বা কোথায় থাকে?

মহাভারতে এই অস্বাভাবিক কথার সম্পর্কও নাই। তাহাতে আছে, রাজা পরিক্ষিৎ গর্ভ মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা পীড়িত হওয়ায় নিশ্চেষ্ট শবাকারে ভূমিষ্ঠ হইলে তদ্দর্শনে কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা এবং বান্ধবদিগের অন্যান্য যোষিৎ সকল রোদন ও অশেষ প্রকারে ভগবান্ বাসুদেবের স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন।

পরে সেই পুরুষ-প্রবর কৃষ্ণ উত্তরার বিপুল বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া সলিল স্পর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিসংহার করিতে লাগিলেন। বিশুদ্ধাত্মা অচ্যুত দাশার্হ কৃষ্ণ বালকের জীবনদানে প্রতিজ্ঞা করিয়া অখিল ভূমণ্ডলকে শ্রবণ করাইয়া বলিলেন যে, উত্তরে! আমি মিথ্যা বলি নাই, আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা সত্য হইবে; এই দেখ, সকলের সমক্ষেই আমি এই বালককে জীবিত করি। পূর্ব্বে যখন কোনরূপে মৎকর্ত্তৃক অণুমাত্রও মিথ্যা উক্ত হয় নাই এবং আমি যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হই নাই, তখন সেই পুণ্যবলেই এই বালক জীবিত হউক। যেমন ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণগণ আমার প্রিয়, অভিমন্যুর পুত্রও তদ্রূপ প্রিয়; অতএব এই মৃতজাত পুত্র জীবিত হউক। যখন আমি বিজয় অর্জ্জুনের সহিত কখন বিরোধ করি নাই, তখন সেই সত্য অনুসারে এই মৃতশিশু জীবিত হউক। যখন সত্য এবং ধর্ম্ম আমাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছেন, তখন অভিমন্যুজাত এই মৃত-শিশু জীবিত হউক। কংস ও কেশী যে ধর্ম্মতঃ মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, সেই সত্যধর্ম্ম অনুসারে অদ্য এই মৃত-বালক জীবিত হউক। বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে সেই বালক ক্রমে ক্রমে সচেতন হইয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল সঞ্চালন করিতে লাগিল।

একই প্রস্তাব উভয় গ্রন্থে এইরূপ বিভিন্ন আকারে লিখিত দেখিয়াও কি বলিতে ইচ্ছা হয় যে, মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত একই কলমে আঁকা?

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে—

পরিক্ষিৎ রাজার জন্মবিবরণ।

শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া তাঁহা দ্বারা তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইলেন। অতঃপর তিনি সাত্যকি ও উদ্ধব সমভিব্যাহারে দ্বারকায়

চলিয়াছেন, এমন সময়ে যেদিন শুভলগ্ন উপস্থিত হইল, সেইদিন সেই শুভলগ্নে উত্তরার গর্ভ হইতে দ্বিতীয় পাণ্ডুর ন্যায় রাজা পরীক্ষিৎ ভূমিষ্ঠ হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ধৌম্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন ও বালকের জাতকর্ম্মাদি করাইয়া তাঁহাদিগকে সুবর্ণ, গো, গ্রাম, হস্তী এবং নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী দান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা প্রচুর পরিমাণে দান লাভে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! এই বালককে বিষ্ণু রক্ষা করিয়াছেন, অতএব ইহার নাম বিষ্ণুরাত অর্থাৎ বিষ্ণুদত্ত রহিল।

মহাভারতে কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয়। অশ্বমেধ পর্ব্বে আছে, মহাত্মা বাসুদেব ও ব্যাসদেব বহু প্রকার উপদেশ প্রদানে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যভার গ্রহণ করাইলে, ব্যাসদেব তাঁহাকে একটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে আদেশ করেন। তাহাতে রাজা যুধিষ্ঠির উত্তর দেন যে, ভাণ্ডারে ধনরত্ন কিছুই নাই নাই, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন সমস্ত নষ্ট করিয়াছে। সুতরাং অর্থ ভিন্ন যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে কিরূপে? তখন মহর্ষি মরুত রাজার যজ্ঞের কাহিনী কহিয়া, হিমালয়-পর্ব্বতস্থিত সেই যজ্ঞের অসংখ্য সুবর্ণ আনয়ন পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞ করার জন্য রাজা যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে তাঁহারা রথ, অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র ও বাহক প্রভৃতি লইয়া ঐ অগণিত স্বর্ণ আনিতে হিমালয়ে গমন করেন।

পরিক্ষিতের জন্ম সম্বন্ধে লিখিত আছে, রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ স্মরণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞোপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে দ্বারকা হইতে হস্তিনাপুরে আসিয়া উপস্থিত হন, সেই সময়ে শবরূপে পরীক্ষিৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ায়, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং উত্তরার রোদনে, অনুরোধে, স্তবনে ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক ঐ মৃত বালকের প্রাণদান করেন। ভরত-কুল ক্ষীণপ্রায় অবস্থায় অভিমন্যু-সুত উৎপন্ন হওয়াতে তিনিই উহার নাম রাখেন পরিক্ষিৎ। তৎকালে যুধিষ্ঠিরাদি কেহই বাড়ীতে ছিলেন না;—তাঁহারা ধৌম্য পুরোহিত-সহ হিমালয়ে গিয়াছিলেন এবং পরিক্ষিৎ এক মাস বয়স্ক হইলে, বাটীতে প্রত্যা-গমন করিয়াছিলেন। স্বস্তিবাচনাদি জাত বালকের যাহা কিছু কর্ম্ম, গোবিন্দের আদেশে ভরতকুলাঙ্গনাগণ ব্রাহ্মণ দ্বারা তাহা সমস্তই করাইয়াছিলেন। সুতরাং উত্তরার গর্ভ হইতে আর একটী বালক, দৈবকীর গর্ভ হইতে আর একটী

কৃষ্ণ এবং কুন্তীদেবীর গর্ভ হইতে আর একটী যুধিষ্ঠির না জন্মিলে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা পোষায় কৈ ?—রক্ষা পায় কিসে ?

এক ব্যাসদেব যদি মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত, এই দুই গ্রন্থই লিখিবেন, তাহা হইলে তিনি এক গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে অতি অল্প-সময় মধ্যে যুধিষ্ঠির দ্বারা তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইয়া, যুধিষ্ঠির বাটীতে থাকিতে—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় যাওয়ার প্রাক্কালে পরিক্ষিৎকে জন্মাইয়া ও ধৌম্য ব্রাহ্মণ দ্বারা তাহার নাম রাখাইয়া, আবার আর একগ্রন্থে স্বীয় আদেশে যুধিষ্ঠির দ্বারা একটীমাত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইলেন কেন ? পরীক্ষিতের জন্ম সময়ে যুধিষ্ঠির-দিগকে হিমালয়ে রাখিলেন কেন ? সেই সময়ে যজ্ঞোপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে হস্তিনায় আনিলেন কেন এবং সেই শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা পরিক্ষিৎ নাম রাখাইলেন কেন ? ইহার পরও কি আর তাঁহাকে সত্যবাদী বলিতে সাহস হয় ? এই সকল অকাট্য কারণেই বলিতে হয়, শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাস-কৃত নয়,—উহা তাঁহার নামে কৃত্রিম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধ দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ে—

জরাসন্ধ বধ।

শুকদেব কহিলেন, একদা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, কুটম্ব, বান্ধব প্রভৃতির সমক্ষে স্তব-বিস্তারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা আমি তোমার পবিত্র বিভূতি সকলের অর্চ্চনা করিতে মনঃস্থ করিতেছি। ইহা বলিয়া তিনি আবার স্তব করিলেন। তৎপরে ভগবান্ কহিলেন, হে রাজন্! হে শত্রুকর্ষণ! আপনি যাহা সঙ্কল্প করিতেছেন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। আপনার এই মঙ্গলদায়িনী কীর্ত্তি সর্ব্বলোকে পরিব্যাপ্ত হইবে। প্রভো! এই মহা-যজ্ঞ ঋষিগণের, পিতৃগণের, দেবগণের, বন্ধুগণের এবং আমাদিগেরও অভীপ্সিত। আপনি সমুদয় নৃপতিকে জয় ও পৃথিবী বশীভূত করিয়া যাবতীয় সম্ভার সুসম্পন্ন করত উৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। আপনার ভ্রাতা সকল লোকপালদিগের অংশে জন্মিয়াছেন এবং ভক্তি দ্বারা আমাকেও বশীভূত করিয়াছেন। মদ্ভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তি জগতে অজেয়; মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারেন না। ভগবানের কথা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি ভ্রাতৃগণকে দিগ্বিজয়ে নিযুক্ত করিলেন। সহদেব দক্ষিণদিকে, অর্জ্জুন উত্তরদিকে, ভীম পূর্ব্বদিকে এবং নকুল পশ্চিমদিকে প্রেরিত হইলেন। দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, তাঁহারা বলে জরাসন্ধ ভিন্ন সমস্ত রাজাদিগকে পরাজিত করিলেন ও প্রচুর পরিমাণে ধনরত্ন আনিলেন। একমাত্র রাজা জরাসন্ধ ব্যতীত, আর সকলেই পরাস্ত হইয়াছেন শুনিয়া, রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, আদি-পুরুষ হরি, উদ্ধবের কথিত উপায় প্রস্তাব করিলেন এবং ভীমসেন, অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ এই তিনজনে ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া জরাসন্ধের রাজধানীতে উপনীত হইলেন। আতিথ্য-বেলায় উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণ-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের নিকট কহিতে লাগিলেন, আমরা বহুদূর হইতে আসিয়াছি। ব্রাহ্মণ যাহা যাহা যাচ্ঞা করে, তাহা দান করা উচিত। আপনার মঙ্গল হউক, আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। তখন জরাসন্ধ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং লক্ষণ দ্বারা তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া

নিশ্চয় করিলেন। তথাপি তিনি কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আপনাদের প্রার্থনা কি, তাহা প্রকাশ করুন। এমন কি, আমার মস্তক প্রার্থনা করিলে, আমি তাহাও আপনাদিগকে. দান করিব। ইহার পর ভগবান্ বলিলেন, আমরা ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ প্রার্থনা করিয়া এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। ইনি কুন্তীর পুত্র ভীম, ইনি তাঁহার ভ্রাতা, আমাকে ইহাঁদিগের মাতুল-পুত্র কৃষ্ণ, আপনাদিগের শত্রু বলিয়া জানিবেন। ইহার পর জরাসন্ধ কহিলেন, তুমি ভীরু, আমার ভয়ে সমুদ্রের শরণ লইয়াছ; অর্জ্জুন বালক, সুতরাং যুদ্ধের অযোগ্য। অতএব ভীমই মাত্র যুদ্ধ করিবার যোগ্যপাত্র, তাঁহার সঙ্গেই আমার যুদ্ধ হইবে। এই কথা বলিয়া তিনি ভীমসেনকে একটী মহতী গদা দান করিলেন, নিজেও একটী গদা লইলেন। অতঃপর উভয়ে গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে উভয়ে উভয়কে গদা দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। তাহাতে পরস্পরের বাহু, জঙ্ঘা ও স্কন্ধদেশে আঘাত লাগাতে ঐ গদা চূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণ জরানাম্নী রাক্ষসীর কথা মনে করিয়া ভীমকে একটী শাখা বিদারণ করিয়া দেখাইলেন। তদ্দর্শনে ভীম জরাসন্ধের দুই পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে ভূমিতলে নিপতিত করিলেন এবং পদ দ্বারা তাঁহার এক পা চাপিয়া রাখিয়া, অপর পা ঊর্দ্ধে উঠাইয়া জরাসন্ধকে দুইভাগ করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে জরাসন্ধ নিহত হইলে, অর্জ্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। তৎপরে বন্দীকৃত রাজগণকে মুক্ত করাতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জরাসন্ধের পুত্র কৃষ্ণের আদেশে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইলে, তাঁহারা পুনরপি কৃষ্ণের স্তব করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণে স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাহার পর ভগবান্ জরাসন্ধের পুত্রকে সিংহাসনারূঢ় করিয়া ভীমার্জ্জুন সহ ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত বিবরণ কহিলেন।

গদায় গদায় আঘাত লাগাতে যে গদা চূর্ণ হইল না, সেই গদা-দুইটা কিন্তু ভীম ও জরাসন্ধের শরীরে লাগিয়া চূর্ণ হইয়া গেল, ইহা বড়ই বিচিত্র কথা! তাহার পর মহাভারতে ভীমের সঙ্গে জরাসন্ধের গদা-যুদ্ধের কাহিনী আদৌ লিখিতই নাই। অস্ত্র-যুদ্ধে জরাসন্ধ অজেয় ছিলেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ অসাধারণ নীতি-কৌশলে জরাসন্ধকে ভীমের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণের সেই নীতি-কৌশল বাজেয়াপ্তপূর্ব্বক গদা-যুদ্ধের প্রবর্ত্তক বানাইয়াছেন জরাসন্ধকে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের যশ কাড়িয়া নেওয়া হইল কি না ? ব্যাসদেবের মহাভারতে ও হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কর্ম্মের চালক, অধর্ম্মের বিনাশক এবং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তিনি অদ্বিতীয় নীতিজ্ঞ, ইতিহাসাদি নানাবিষয়ে সুপণ্ডিত, সর্ব্বজ্ঞ, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়। তাঁহার বাক্য কখনই বিফল হইত না, ভ্রমেও তিনি মিথ্যা কথা কহিতেন না, নীতি অনুসারেই সকলকে সুপরামর্শ দিতেন। শ্রীকৃষ্ণই জগতের চালক, তাঁহার কিন্তু কেহই চালক ছিল না। যিনি বিশ্ব-আত্মা, বিশ্ব-মূর্ত্তি, তাঁহাকে চালিত করিতে পারে, এমন শক্তি কার ? শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের চালক হইয়াছেন উদ্ধব। শ্রীকৃষ্ণ সুপরামর্শ দানে অপটু ও অক্ষম ছিলেন, তাই যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসায়, তন্মুহূর্ত্তেই রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছিলেন ; যুধিষ্ঠিরও তখনই ভ্রাতাদিগকে দিগ্বিজয়ে পাঠাইলেন। তাঁহারা কিন্তু শুভে শুভে ফিরিতে পারিলেন না ; রাজা জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া দিলেন। জরাসন্ধের হাতে ঠেকিয়া অপ্রতিভ ও অপদস্থ হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের পাক্কা-উপদেশ স্মরণ করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বলিয়া ভীমার্জ্জুন সমভিব্যাহারে জরাসন্ধ-বধে প্রস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে অমনতর নির্ব্বোধ, অদূরদর্শী ছিলেন, তিনি উদ্ধবের চালটা মনে করিয়া উদ্ধার পাইলেন, উদ্ধবই যে শ্রীকৃষ্ণের চালক ছিলেন, যুধিষ্ঠির কি তাহা জানিতেন না ? তিনি যদি ঐ যজ্ঞের পরামর্শটা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, শ্রীমদ্ভাগবতের মতে উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই জরাসন্ধের হাতে অপমানিত হইতেন না ! শ্রীকৃষ্ণের কথায় ভীমার্জ্জুন অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই সঙ্গে নিলেন না ; শুধু হাতে ব্রাহ্মণবেশে কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের নিকট গমন করিলেন। জরাসন্ধ ভীমের খালী-হাত দেখিয়া একটা পুরাতন গদা তাঁহাকে দিলেন, সেই গদাটা আবার জরাসন্ধের গায় ঠেকিয়াই চূর্ণ হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের হাল্কা কথায় ভীম তাঁহার দুর্জ্জয় গদা না নিয়া, কি অপরিসীম অনুতাপেই পড়িলেন ! তখন যুদ্ধ করিবেন, না পরিতাপ করিবেন, এই চিন্তায় ভীমের মাথাটা ঘুরিয়া গেল। ভীম যদি তাঁহার স্বকীয় গদাটী সঙ্গে লইয়া যাইতেন, তবে বোধ হয় জরাসন্ধ-বধে তাঁহাকে অত কষ্ট সহ্য করিতে হইত না। ভীমাদি ব্রাহ্মণবেশে জরাসন্ধের

নিকটে গেলেন কেন? ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ইহাই বুঝা যায় যে, যুদ্ধের কথা অপ্রকাশ রাখিয়া ব্রাহ্মণবেশে প্রার্থনা না করিলে, জরাসন্ধ কখনই যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না।

যুধিষ্ঠিরের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আমার ভক্ত অজেয়," তবে জরাসন্ধ, দিগ্বিজয়ে নির্গত যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতাদিগকে পরাস্ত করিলেন কিরূপে? ইহাতে কার্য্য দ্বারা কিন্তু গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। জরাসন্ধ-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ ভীমের পূজা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দুর্ব্বল ছিলেন কি না, তাই প্রবল শত্রু জরাসন্ধের বিনাশক ভীমকে একটা পূজা দেওয়া তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছিল! জরাসন্ধের জন্য দায়-ঠেকা যুধিষ্ঠির; শ্রীকৃষ্ণের এ পূজাটা সেই যুধিষ্ঠির দ্বারা দেওয়াইলেই ভাল হইত! ভীমসেন যে জরাসন্ধকে বধ করিয়াছিলেন, তাহা কার নৈতিক চালে? তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণকে পূজা দেওয়া কি ভীমের কর্ত্তব্য ছিল না? শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণবেশে জরাসন্ধের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, হে রাজন্! তোমার মঙ্গল হউক। অতঃপর জরাসন্ধ-বধ হওয়ায় কৃষ্ণের আশীর্ব্বাদ-বাক্য মিথ্যা হইল; সুতরাং এখানে গ্রন্থকার কার্য্যতঃ শ্রীকৃষ্ণকে আবারও মিথ্যাবাদী বানাইলেন। তবে কি শ্রীকৃষ্ণ তাবকতায় সন্তুষ্ট হইতেন যে, সমস্ত গ্রন্থে এক প্রকার স্তব লিখিয়া তাঁহার নির্ম্মল যশ শ্রীমদ্ভাগবতকার কীর্ত্তন করিলেন? তাহার পর কতকগুলি রাজাকে জরাসন্ধ কি কারণে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, গ্রন্থকার আদবেই তাহা প্রকাশ করেন নাই।

জরাসন্ধের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ নিজ নামে, অথবা বসুদেবের পুত্র বলিয়া পরিচয় না দিয়া, পরিচয় দিলেন ভীমের মাতুল-ভ্রাতা বলিয়া। ওদিকে আবার পাণ্ডু-রাজার পুত্র বলিয়া ভীমার্জ্জুনের পরিচয় না দিয়া, তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া হইল মাতৃনাম কহিয়া। ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয়, জরাসন্ধ ভীমার্জ্জুনের মাকেই চিনিতেন, পাণ্ডুরাজা এবং শ্রীকৃষ্ণকে তিনি কস্মিন্‌কালেও জানিতেন না। অথচ গ্রন্থকার এই শ্রীমদ্ভাগবতেই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে জরাসন্ধের অষ্টাদশ বার যুদ্ধের কাহিনী লিখিয়াছেন। তবে ভীমদিগের মাতুল-ভ্রাতাকেই জরাসন্ধ জানিতেন, শ্রীকৃষ্ণকে কখনও জানেন নাই, ইহার তাৎপর্য্য কি?

ব্যাসদেবের মহাভারতে, যুধিষ্ঠিরের সভাপ্রবেশকালে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে ছিলেন না ;—তিনি ছিলেন দ্বারকাতে। জরাসন্ধকে বধ করার পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ কখনই দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন না। তাঁহারা দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন জরাসন্ধ-বিনাশের পরে। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ কোন কালেও যুধিষ্ঠিরকে প্রভু সম্বোধন করেন নাই। মহাভারতে এবং হরিবংশে তিনি কখনও কোন রাজা কিংবা আত্মীয়ের নিকট স্তাবকতা কি ভীরুতা অবলম্বনে কথা বলেন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে মহাভারত ও হরিবংশের নিতান্ত বিপর্য্যয়ে শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ রচিত।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ কেমন নীতিজ্ঞ, কেমন অগাধ-বুদ্ধিসম্পন্ন, কেমন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, তাহা দেখুন।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে।—ময়দানবকর্তৃক সভা নির্ম্মিত হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির সেই সভায় প্রবেশ করিলেন। তখন মহর্ষি-দেবর্ষিগণও সেখানে উপস্থিত হইয়া, সভার অপূর্ব্ব শোভা দর্শনে রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করিতে কহিলেন। তদনুসারে তিনি মন্ত্রী ও ভ্রাতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারাও তাঁহাকে রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিপ্রায় দিলেন। তৎপরে ধৌম্য পুরোহিত এবং পুনরপি ভ্রাতৃগণকে জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা বলিলেন, মহারাজ! কেন চিন্তা করেন? আপনার অভিপ্রেত যজ্ঞ অবশ্য সুসম্পন্ন হইবে। ইহাতেও যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ ঘুচিল না ; তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আনিতে দূত পাঠাইলেন। দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে, যুধিষ্ঠির তাঁহাকেও রাজসূয় যজ্ঞের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অনভিজ্ঞ বা অদূরদর্শী ছিলেন না এবং অদূরদর্শীর ন্যায় কাহাকে পরামর্শও দিতেন না। যুধিষ্ঠির, রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারি কি না, জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীকৃষ্ণ মূর্খের মত 'হাঁ, পারেন' বলিয়া উত্তর করেন নাই যে, যুধিষ্ঠির জরাসন্ধের নিকটে প্রতিহত হইয়া তাঁহার বাক্য ব্যর্থ বোধ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ নীতি-বিশারদ সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত সম্রাটের উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু জরাসন্ধ বাহুবলে সমস্ত রাজাকে পরাজিত করিয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছেন। শিশুপাল, বক্রদন্ত, ভগদত্ত প্রভৃতি বড় বড় রাজারা কর-স্বরূপে বহুমূল্য রত্নাদি প্রদান করিয়া জরাসন্ধের উপাসনা

করিতেছেন। তাঁহার ভয়ে কতকগুলি রাজা স্বরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছেন এবং মৃগরাজ যেমন অবলীলাক্রমে হস্তিগণকে আক্রমণ করিয়া গিরিগুহায় বদ্ধ রাখে, তিনিও সেইরূপ কতকগুলি রাজাকে ধরিয়া আনিয়া দুর্গমধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের একশতটী পূর্ণ হইলেই মহাদেবের পূজাতে বলি-প্রদান করিবেন ; এইক্ষণ বাকিমাত্র চৌদ্দটী। জরাসন্ধ বর্ত্তমান থাকিতে আপনার রাজসূয় যজ্ঞ করা সুকঠিন। উহাতে আপনার যদি একান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথমে জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়া বন্দীকৃত রাজগণকে মুক্ত করিলে, আপনি নিঃসন্দেহ পৃথিবীর অধীশ্বর হইবেন এবং রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিবেন। তাহা না হইলে আপনার অভিপ্রেত যজ্ঞ কখনই সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে দেশ, কাল, কার্য্য বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক আপনার যাহা অভিপ্রায় হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করুন।

শ্রীকৃষ্ণের নীতিগর্ভ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুপরামর্শ এবং হিতকর উপদেশ শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং সেই উপদেশেরই বশবর্ত্তী হইয়া, জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে মহান্ অনর্থ ঘটিবে, এই ভাবিয়া হতাশ হইলেন ও শান্তি অবলম্বন করিতে চাহিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন কহিলেন, আমাদিগের রাজসূয় যজ্ঞ করা অপেক্ষা জরাসন্ধকে বধ করিয়া বন্দীকৃত রাজগণকে মুক্ত করাই মহৎ যশের কর্ম্ম। ইহা না করিলে লোকে আমাদিগকে হীনবীর্য্য বলিয়া উপহাস করিবে। জরাসন্ধকে বধ করিয়া বন্দীকৃত রাজগণকে মুক্ত করিলে, সাম্রাজ্যও যে আপনা-আপনিই হস্তগত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ভীমার্জ্জুনের একান্ত ইচ্ছা যে, জরাসন্ধকে বধ করিয়া বন্দীকৃত রাজগণকে মুক্ত করেন। তদনুসারে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের নিকটে জরাসন্ধের বধোপায় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং জরাসন্ধ কিরূপে এত বড় দুর্জ্জয় হইয়াছেন, তাহাও জানিতে চাহিলেন।

ভারতবর্ষের সমস্ত রাজগণের, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস শ্রীকৃষ্ণ বিদিত ছিলেন। কাহার কিরূপ শক্তি, কাহার কিরূপে মৃত্যু, তিনি সকলই জানিতেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ সুপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তাই তাঁহার নিকটে জরাসন্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে যুধিষ্ঠির আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ, জরাসন্ধের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের ইতিহাস কহিয়া তাঁহার জন্ম ও কি কি কারণে তিনি দুর্জ্জয় হইয়াছিলেন এবং যুদ্ধকালে হংস ও ডিম্বক যে তাঁহার পার্শ্ব রক্ষা করিত, তাহাতে যে তিনি অজেয় ছিলেন, তাহা সমস্তই বিস্তারিতরূপে কহিলেন। উহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির একেবারেই হতাশ হইলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, জরাসন্ধের পার্শ্বচর বীরদ্বয়ের মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে বধ করিবার এই-ই উপযুক্ত সময়। কিন্তু ঐ দুরাত্মা নৃশংস, বন্দীকৃত রাজগণকে সংহার করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধন না করিতে করিতেই উহাকে বধ করা উচিত। হে ধর্ম্মাত্মন্! এক্ষণে যিনি ঐ পাপাত্মার নিষ্ঠুর কর্ম্মে বিঘ্নোৎপাদন পূর্ব্বক বন্দীকৃত রাজাদিগকে মুক্ত করিতে পারিবেন, তাঁহার কীর্ত্তি চিরকাল বিরাজিত রহিবে। যিনি ঐ পাপিষ্ঠকে সংহার করিবেন, নিঃসন্দেহ তিনিই সাম্রাজ্যের অধিকারী হইবেন। ছিদ্রানুসারে নীতি-প্রয়োগে আক্রমণ করিলে, প্রবল শত্রুকেও অনায়াসে নিপাতিত করা যায়।

অধার্ম্মিক অত্যাচারী দুষ্টকে সংহার করিয়া ধর্ম্ম-সংস্থাপন করাই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য; সুতরাং তিনি জরাসন্ধকে বধ করিতে উৎসাহী হইয়াছেন এবং ভীমার্জ্জুনকে তাঁহার সঙ্গে দিতে কহিতেছেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে রাজন্! যদি আমার প্রতি আপনার স্নেহ এবং বিশ্বাস থাকে, তবে ভীমার্জ্জুনকে আমার হস্তে ন্যাস স্বরূপ অর্পণ করুন। তখন যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মধুসূদন! তুমি আর আমাকে লজ্জা দিও না। তুমি আমাদিগের অধীশ্বর, আমরা তোমার আশ্রিত। তুমি যাহাই কহিবে, আমরা তাহাই করিব। তোমার কথায় আমি জরাসন্ধকে নিহত, বন্দীকৃত রাজগণকে মুক্ত এবং নিজেও অভিলষিত যজ্ঞের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের বল-বিক্রম সমস্তই পরিজ্ঞাত ছিলেন। অস্ত্রযুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারা যাইবে না, এই বিবেচনাতেই তিনি স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশ পরিগ্রহ করিলেন এবং ভীমার্জ্জুনকেও ঐ বেশ ধারণ করাইলেন; তাঁহারা অস্ত্রাদি কিছুই সঙ্গে নিলেন না। স্নাতক ব্রাহ্মণ সমধিক আদরণীয়; সুতরাং জরাসন্ধের নিকটে বিনা-বাধায় যাইবার পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা, তাই স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে ভীমার্জ্জুন সহ শ্রীকৃষ্ণ

মগধদেশে গমন করিলেন। তাঁহারা কতিপয় দিবস মধ্যে জরাসন্ধের রাজধানীতে পঁহুছিয়া, চৈত্যক-ভূধরের শৃঙ্গ ও ভেরীত্রয় ভগ্ন করিলেন এবং রাজবাটীর অপ্রকাশ্য দ্বার দিয়া প্রবেশপূর্ব্বক একবারেই রাজ-সন্নিধানে উপনীত হইলেন। তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্র জরাসন্ধ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন ও আসন প্রদানপূর্ব্বক পাদ্যার্ঘাদি আনিবার জন্য ভৃত্যদিগকে অনুজ্ঞা করিলেন। তখন তাঁহার তাদৃশ সামাজিকতা দর্শনে ভীমার্জ্জুন মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; মহা-বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজন্! ইহাঁরা নিয়মস্থ আছেন, এজন্য এক্ষণে কোন কথাই কহিবেন না; অর্দ্ধরাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। অতঃপর রাজা তাঁহাদিগকে যজ্ঞশালায় সংস্থাপিত করিয়া স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং যথোক্ত সময়ে যাইয়া বীরত্রয়ের নিকটে উপনীত হইলেন।

মহাভারতে, শত্রু গৃহে শ্রীকৃষ্ণ প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায়। তিনি যেমন বীরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শত্রুগৃহে শত্রুর কথার উত্তরও সেইরূপই দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যই ধর্ম্ম-সংস্থাপন করা এবং অধার্ম্মিক লোকদিগকে সংহার করা। ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই তাঁহার অবগত ছিল, তিনি সকল বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়াই লোকে তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার জ্ঞান করিত। শ্রীকৃষ্ণ সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি কখনই জায়গায় জায়গায় মিথ্যা কথা কহিয়া, চতুর্ভুজমূর্ত্তি সাজিয়া, লোক-ভুলানের পসার খুলিয়াছিলেন না। কথার কাঙ্গাল কিংবা শত্রুগৃহে ভীরু ছিলেন না যে, জরাসন্ধের নিকটবর্ত্তী হইয়াই তিনি 'মঙ্গল হউক' বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তিনি কখনই আতিথ্য-বেলায় আমরা তিনটী ব্রাহ্মণ উল্লেখে মিথ্যা কথা কহিয়া যাচ্ঞা করিয়াছিলেন না। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র মাটী করিয়াছে।

জরাসন্ধের এরূপ নিয়ম ছিল যে, রাত্রিশেষেও যদি স্নাতক ব্রাহ্মণ সমাগত হওয়ার কথা শুনিয়াছেন, তবে তৎক্ষণাৎই আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

অনায়াসে জরাসন্ধের সাক্ষাৎ-লাভ উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ স্নাতক ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। কেননা, ক্ষত্রিয়বেশে গেলে, সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র, রথ রথী, সমস্তই

লইতে হয় ; সুতরাং তাঁহার দেখা পাওয়া আর সহজ-সাধ্য হয় না। তাহার পর তাঁহাকে বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য তিনি অস্ত্রাদিও লয়েন নাই। এই নীতি অবলম্বনেই শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে গিয়াছিলেন।

অর্দ্ধরাত্র সময়ে যজ্ঞশালায় ব্রাহ্মণ-বেশধারী বীরত্রয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া জরাসন্ধ তাঁহাদের অপূর্ব্ব বেশভূষা দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহারা রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, আপনার মোক্ষপদপ্রাপ্তি হউক। অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে উপবেশন করিতে বলাতে, তাঁহারা উপবিষ্ট হইয়া যজ্ঞীয় অগ্নিত্রয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

জরাসন্ধ বীরত্রয়কে রক্তচন্দন ও পুষ্পমাল্য পরিগ্রহ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে স্নাতক ব্রাহ্মণত্রয় ! আমি অবগত আছি যে, স্নাতক ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ সময় ভিন্ন কদাপি পুষ্পমালা ব্যবহার করেন না ; তোমাদের নিয়ম দেখিতেছি তাহার বিপর্য্যয়। অধিকন্তু দেখিতেছি, তোমাদের হস্তে শরাসনাকর্ষণ-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। তোমরা কে, স্বরূপ বর্ণন কর। তোমরা ক্ষত্রিয়-তেজ ধারণ করিয়া কি নিমিত্ত স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছ ? তোমাদের কপট-বেশ ধারণের অভিপ্রায় কি, তাহা বল। তোমরা রাজদণ্ডের ভয় না করিয়া চৈত্যক-ভূধরের শৃঙ্গ ভেদপূর্ব্বক অপ্রকাশ্য দ্বার দিয়া কি নিমিত্ত এ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ ? ব্রাহ্মণবেশে আসিয়াও মৎপ্রদত্ত সৎকার গ্রহণ করিতেছ না, তোমাদের অভিসন্ধি কি ?

জরাসন্ধের বাক্যাবসানে বাগ্মিপ্রবর শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজন্ ! আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনার যেরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহাই থাকুক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণই স্নাতক-ব্রতে ব্রতী হইতে পারেন। তন্মধ্যে বিশেষ নিয়মধারী ক্ষত্রিয়গণ সর্ব্বদাই সৌভাগ্যশালী হন। পুষ্পবন্ত হইয়া নিঃসন্দেহ শ্রীমন্ত হয়। এই বিশ্বাসেই আমরা মাল্য ধারণ করিয়াছি। হে জরাসন্ধ ! ক্ষত্রিয়েরা স্বীয় বাহু দ্বারাই আপনার ক্ষমতা ও বীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কথায় কিছুই তেজ প্রকাশ পায় না। ক্ষত্রিয়দিগের সৃষ্টিকালে বিধাতা তাঁহাদিগের বাহুদ্বয়ে স্বকীয় বীর্য্য সংস্থাপিত করিয়াছেন। যদি তোমার তাহা দেখিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে

অনতিবিলম্বে তাহা দেখিতে পাইবে। নীতিশাস্ত্রের মর্ম্মই এই যে, শত্রু-গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে অদ্বারে এবং বন্ধুবান্ধবের গৃহে প্রকাশ্য দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। তুমি ইহা অবগত হও যে, আমরা বিশেষ অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্তই গুপ্তদ্বার দিয়া তোমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছি। শত্রুর পরিচর্য্যা গ্রহণ না করা, আমাদিগের চিরপ্রসিদ্ধ কৌলিক নিয়ম।

জরাসন্ধ কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আমি যে কোন সময়ে তোমাদের সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছি, তাহা স্মরণ হইতেছে না। যদি আমি কখন শত্রুতা না করিয়া থাকি, তবে তোমরা কিজন্য আমাকে শত্রু মনে করিতেছ? যিনি অকৃতাপরাধে অন্যের ধর্ম্মে উপঘাত করেন, তিনি নারকী হন। ক্ষত্র-ধর্ম্মই সৎপথের প্রবর্ত্তক। আমি ধর্ম্মানুরাগী। আমি কখনই প্রকৃতিমণ্ডলের কোন অপকার করি নাই, তবে কি নিমিত্ত আমাকে শত্রু মনে করিতেছ?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজন্! তুমি বলপূর্ব্বক বহুল রাজগণকে পরাজয় করিয়া বলিপ্রদানার্থ তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ। তবে অপকারী নও বলিয়া কেমন করিয়া বলিতেছ? রাজা হইয়া কোন্ ব্যক্তি নিরপরাধে স্বজাতীয়ের হিংসা করিয়া থাকে? তুমি কোন্ বিবেচনায় তাঁহাদিগকে মহাদেবের পূজায় বলি দিতে বাসনা করিয়াছ? আমরা ধর্ম্মচারী, ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ। তোমার দোষে আমাদিগকেও অপরাধী হইতে হইবে। আমরা কস্মিন্‌কালেও নর-বলির নাম শ্রবণ করি নাই। তুমি কি নিমিত্ত শশাঙ্কশেখরের আরাধনায় নর-বলি দিতে উদ্যত হইয়াছ? হে জরাসন্ধ! তুমি সবর্ণগণ পশুভূত করিয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম করিতেছ। তুমি ব্যতীত কোন্ নরাধম আর এরূপ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে? আর্ত্তের দুঃখ বিমোচন করাই আমাদিগের কুল-ব্রত। কিন্তু তুমি আর্ত্ত-জ্ঞাতিগণের উচ্ছেদে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ। অতএব এক্ষণে আমরা জ্ঞাতিগণের কল্যাণ-কামনায় তোমাকে বিনষ্ট করিতে এখানে আসিয়াছি। তুমি মনে করিয়াছ যে, এই ভূমণ্ডলে তোমার সদৃশ বীর-পুরুষ আর কেহই নাই। তাহা কেবল তোমার মতিভ্রম। ক্ষত্রিয়গণ স্বর্গলাভ-বাসনাতেই রণযজ্ঞে দীক্ষিত হয়। বেদাধ্যয়ন, মহৎ যশ, তপস্যা ও সংগ্রাম-মৃত্যু, এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্মের প্রত্যেকই স্বর্গলাভের মূলীভূত। তন্মধ্যে বেদাধ্যয়নাদি যথানিয়মে

সম্পন্ন না হইলে স্বর্গলাভের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে ; কিন্তু ক্ষত্র-কুলোচিত বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক সংগ্রামে জীবন-বিসর্জ্জন করিলে, স্বর্গলাভ হইবেই হইবে, কোন মতে অন্যথা হইবার নহে। আমাদিগের সহিত শত্রুতা হওয়ায় তোমার স্বর্গারোহণের পথ যেরূপ পরিষ্কার হইয়াছে, সেরূপ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। তুমি অসংখ্য মাগধ-বলে দর্পিত হইয়া প্রায় সকল রাজারই অবমাননা করিয়া থাক, তোমার অহঙ্কার নিতান্ত অসহ্য ; অতএব তাহা পরিত্যাগ কর। নতুবা সপরিবারে তোমাকে যমালয়ে গমন করিতে হইবে। আমরা ব্রাহ্মণ নহি, কেবল ছলনা দ্বারা তোমাকে নিহত করিবার উদ্দেশেই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছি। আমরা তিন জনই ক্ষত্রিয়। আমি হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ, আর এই দুই বীর স্বর্গীয় পাণ্ডুরাজার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র ভীমসেন ও ধনঞ্জয়। আমরা তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রার্থনা করিতেছি। তুমি হয় যাবতীয় বন্দীকৃত নৃপতিকে মুক্ত করিয়া দাও, নতুবা প্রশান্তমনে আমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া শমনভবনে গমন কর।

জরাসন্ধ কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি পরাজয় না করিয়া কোন রাজাকেই আনি নাই। আমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। এখন কি তোমাদের কথায় ভীত হইয়া ছাড়িয়া দিব? তুমি যে যুদ্ধের কথা বলিতেছ, আমি তাহাতে সম্মত আছি। আমি একাকী তোমাদের এক বা দুই অথবা এককালে তিনজনের সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে পারি। অতঃপর জরাসন্ধ তাঁহার পুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে আদেশ দিলেন এবং কৌশিক ও চিত্রসেন নামক দুই বীরকে স্মরণ করিলেন। পূর্ব্বে ইহারাই হংস ও ডিম্বক নামে তাঁহার পার্শ্বচর ছিল। জরাসন্ধ যাদবগণের বধ্য নয় বলিয়া বিধাতার বাক্য স্মরণপূর্ব্বক বাসুদেব স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না।

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বাসুদেব জরাসন্ধকে যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জরাসন্ধ! আমাদের মধ্যে কাহার সহিত তোমার যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয়, তোমার সহিত যুদ্ধার্থে কে সজ্জীভূত হইবেন? মহাবল জরাসন্ধ ভীমসেনকে বিপুলকায় দেখিয়া তাঁহারই সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন।

জরাসন্ধ প্রস্তুত হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, ভীমসেন! তুমি অগ্রসর হও; আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। ইহার পর ভীমসেনকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, ভীমসেন কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিয়া সগর্ব্বে জরাসন্ধের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। নিরায়ুধ বাহুমাত্র-সহায় দুই বীর পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া শার্দ্দূলের ন্যায় প্রহৃষ্টচিত্তে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পরে করগ্রহণ, পদাভিবন্ধন ও জঙ্ঘাঘাত দ্বারা রাজ-ভবনের প্রকোষ্ঠ সকল কম্পিত করিলেন। মুষ্ট্যাঘাত চপেটাঘাত ইত্যাদিতে পরস্পর পরস্পরকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের বাহুযুদ্ধ দর্শনার্থ বহুলোক সমাগত হইল। ঐ বীরদ্বয় ত্রয়োদশ দিবস পর্য্যন্ত অনাহারে অবিশ্রামে যুদ্ধ করিলেন, চতুর্দ্দশ দিবসে জরাসন্ধ শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইলেন। তখন ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া জরাসন্ধকে বধ করিবার বাসনায় দৃঢ়রূপে আক্রমণ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! বিপক্ষ এখনও অজেয়ভাবেই রহিয়াছে; এ অবস্থায় কিরূপে ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারি? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ভ্রাতঃ! বিলম্ব করিবার আবশ্যক কি? তোমার দুর্লভ দৈববল, যাহা তুমি প্রভঞ্জন হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা আর কবে কাহার প্রতি নিয়োজিত করিবে? শ্রীকৃষ্ণের সাঙ্কেতিক বাক্যের মর্ম্মবোধ করিয়া ভীম, জরাসন্ধকে উর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক মস্তকোপরি ঘুরাইতে লাগিলেন। এইরূপে শতবার ঘুরাইয়া সবলে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং জানু দ্বারা তাঁহার মেরুদণ্ড ভগ্ন করিয়া নিষ্পেষণপূর্ব্বক বধসাধন করিলেন। তখন ভীমসেনের গভীর গর্জ্জনের শব্দে সমস্ত লোক ত্রাসিত ও ভয়ে ব্যাকুলিত হইল। তৎপরে তাঁহারা ভ্রাতৃত্রয় মিলিত হইয়া বহির্গত হইলেন এবং জরাসন্ধের সজ্জীকৃত রথে আরোহণ করিয়া দুর্গ হইতে বন্দীকৃত রাজাদিগকে মুক্ত করিলেন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব অমাত্যগণ সহ বীরত্রয়ের নিকট উপনীত হইয়া বহুমূল্য রত্নাদি প্রদানপূর্ব্বক শরণাপন্ন হইলেন। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অভয়প্রদানান্তে পুরোহিত ব্রাহ্মণ-দিগকে ডাকাইয়া বিধানানুসারে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কারামুক্ত রাজগণ শ্রীকৃষ্ণের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, আপনারা আমাদিগকে প্রাণ-দান করিলেন। এক্ষণে এই ভৃত্যদিগের কি কর্ত্তব্য, অনুগ্রহপূর্ব্বক আদেশ-

প্রদানে চরিতার্থ করুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন। আপনারা সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া আনুকূল্য করিবেন। রাজগণও তাহাই করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

অতঃপর তাঁহারা অতি শীঘ্রগমনে ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ, ভীম-কর্ত্তৃক জরাসন্ধ-বধ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক যুধিষ্ঠিরের নিকটে বলিলেন। কারামুক্ত রাজগণ ধর্ম্মরাজের অনুমতি গ্রহণে স্বীয় স্বীয় রাজ্যে গেলেন। বাসুদেবও পিতৃষসা ও সুভদ্রা এবং পঞ্চভ্রাতার নিকট বলিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। এদিকে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন।

মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের দূরদর্শিতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—যতদূর সম্ভবে তাঁহার অদূরদর্শিতা। জরাসন্ধের নিকটে, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের নীতি-কৌশল ও বীরোচিত গর্ব্বিত বাক্য, আর শ্রীমদ্ভাগবতে ভীরুতাব-লম্বনে আতিথ্য বেলায় যাচ্ঞা বাক্য। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ কথার কাঙ্গাল। উদ্দেশ্যের বিপর্য্যয়ে ভয়াকুলিতচিত্তে, 'মঙ্গল হউক' বলিয়া জরাসন্ধের প্রতি কথিত তাঁহার আশীর্ব্বাদ-বাক্যাদি এবং মহাভারতের পাণ্ডিত্য, অসাধারণ বাক্-পটুতা ও শক্তিপূর্ণ তীক্ষ্ণ বাণস্বরূপ বাক্য প্রভৃতির একত্র সমাবেশ করিলে, উভয় গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণ, জরাসন্ধ কিংবা জরাসন্ধ-বধ-বৃত্তান্ত, কখনই এক বলিয়া বোধ হয় না। এই প্রস্তাবে কার্য্যতঃ শ্রীমদ্ভাগবতকার যে ভগবানের নির্ম্মল যশ ধ্বংস করিয়া তাঁহার কুৎসা রচনা করিয়াছেন, ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে যে মহাপাপে নিপতিত হইতে হইবে, তাহার বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ যে ব্যাসদেবের নামে কৃত্রিম করা হইয়াছে, বর্ণিত প্রস্তাবও তাহার বিশুদ্ধ প্রমাণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ে—

শিশুপাল বধ বৃত্তান্তে—

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের সভাস্থ সকলের মধ্যে কাহার পূজা অগ্রে হইবে, সদস্যগণ এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তখন সহদেব কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণের পূজাই পূর্ব্বে হইবে। শ্রীকৃষ্ণই আত্মা; শ্রীকৃষ্ণই অগ্নি, যজ্ঞ, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তা; শ্রীকৃষ্ণই ঈশ্বর। অতএব তিনিই অগ্রে পূজা পাওয়ার যোগ্য। তাঁহাকে শ্রেষ্ঠপূজা দান করুন। তাহা হইলে সকল ভূতের, সকল আত্মার পূজা করা হইবে। ইত্যাদি। ইহা শ্রবণে ব্রাহ্মণগণ সহদেবকে সাধুবাদ করিলেন। তাহার পর যুধিষ্ঠির সন্তুষ্টচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের পাদপ্রক্ষালন করিয়া, ভার্য্যা, ভ্রাতৃগণ ও সুহৃদ্গণ সহ সেই জল মস্তকে ধারণপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন। তখন নয়ন অশ্রুপূর্ণ হওয়াতে তিনি আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তদ্দর্শনে শিশুপাল গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে গালাগালি দিয়া, অস্ত্রশস্ত্র সহ যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও রাজগণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া, নিজেই ক্ষুরধার চক্র দ্বারা শিশুপালের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইত্যাদি।

এই প্রস্তাব সম্পর্কে মহাভারতের কথা না আনিলেও, সম্রাট যুধিষ্ঠিরের পিতামহ ভীষ্মদেব এবং পিতৃব্য প্রভৃতি উপস্থিত ও যজ্ঞকার্য্যে লিপ্ত থাকা সত্ত্বে, যুধিষ্ঠিরের মত একটী সুবিবেচক ধার্ম্মিক রাজা, তাঁহাদিগের নিকট কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কর্ম্ম করিলেন সহদেবের বাক্যে। সহদেব কিন্তু সর্ব্বকনিষ্ঠ। তিনিও কিন্তু অমনতর ফাজিল ছিলেন না যে, এতবড় বিজ্ঞ বিচক্ষণ মুরুব্বিদিগকে লঙ্ঘন করিয়া ফাজিল কথা কহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার হইলেও মানবদেহে যে সম্পর্কে যাহার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তিনি প্রীতমনে তাহাই করিতেন।

যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাই সম্পর্কানুসারে কৃষ্ণ তাঁহাকে অভিবাদন করিতেন। যুধিষ্ঠির আবার শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া জানিলেও, কনিষ্ঠ-জ্ঞানে তাঁহাকে মনে প্রাণে স্নেহ এবং যারপরনাই বিশ্বাস করিতেন। তিনি কখনও শ্রীকৃষ্ণের বাক্য লঙ্ঘন করিতেন না। ইহাতেই—পাদপ্রক্ষালন করিয়া সপরিবারে মস্তকে জলধারণ কিংবা সহস্র পূজা অপেক্ষাও—শ্রীকৃষ্ণ সহস্রগুণে প্রসন্ন হইতেন। সকলেই জানিত, পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা। বস্তুতঃ পাণ্ডবগণ অথবা শ্রীকৃষ্ণ কখনই সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া কোন অমানুষিক ব্যবহার করেন নাই।

ব্যাসদেবের মহাভারতে রাজসূয়-যজ্ঞ যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার পদে পদে বিপরীত। মহাভারতে কোন সদস্য ব্রাহ্মণ কখনই রাজগণকে পূজা দেওয়ার কথা উত্থাপন করেন নাই, অথবা সহদেব সর্ব্বকনিষ্ঠ হইয়া বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে এবং গুরুজনকে উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কিছুই বলেন নাই। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ কখনই ঈশ্বররূপে উপস্থিত হন নাই; তিনি রাজসভায় রাজগণের সহিত সামাজিকরূপে আসীন ছিলেন এবং পাণ্ডবগণের সুহৃদ্রূপে রাজসূয়-যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগের পদপ্রক্ষালনের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের পিতামহ ভীষ্মদেবই যজ্ঞান্তে যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, সমাগত সুহৃদ্, ব্রাহ্মণ এবং রাজাদিগকে অর্ঘ্য প্রদান করা উচিত। তাহাতে যুধিষ্ঠির পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজগণের মধ্যে এই অর্ঘ্য প্রথমে কাহাকে দিতে হইবে, আপনি তাহা অনুমতি করুন। তৎপরে ভীষ্মদেব কিছুকাল মৌনাবলম্বনে থাকিয়া সুবিবেচনা পূর্ব্বক রাজগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব অত্যধিক বলিয়া, প্রথমে তাঁহাকেই অর্ঘ্য দিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। তদনুসারে যুধিষ্ঠির সর্ব্বানুজ সহদেব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য দেওয়াইলেন। তদ্দর্শনে শিশুপাল ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির এবং শ্রীকৃষ্ণকে গালাগালি করিয়া বহুরাজাসহ সভা হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, যুধিষ্ঠির অগ্রসর হইয়া মিষ্টবাক্যে তাঁহাদিগকে ফিরাইয়াছিলেন। অতঃপর শিশুপাল পুনরপি ভীষ্ম এবং কৃষ্ণকে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে ভীম-পরাক্রম ভীমসেন

ক্রোধান্ধ হইয়া শিশুপাল-বধে সমুদ্যত হইলে, ভীষ্মদেব তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন, সভাস্থ সকলকে শিশুপালের জন্মবৃত্তান্ত শুনাইলেন এবং শিশুপালের মৃত্যু যে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে, তাহাও বলিয়া ফেলিলেন। তাহার পর আবারও শিশুপাল গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক তুচ্ছোক্তিতে কালান্তক যমোপম শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জঘন্য ব্যবহার ও অত্যাচারের বর্ণনা করিয়া এবং যে কারণে তিনি উহাঁর শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, এক্ষণে শতাধিক অপরাধ হওয়ায় তাঁহার যে ক্রোধ হইয়াছে, তাহার আর শান্তি হইবার নহে, ইহা বলিয়া, মনে মনে সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ মাত্রই সুদর্শন চক্র আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিয়া শিশুপালের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তন্মূহূর্ত্তে তাঁহার ছিন্নদেহ হইতে একটী তেজ বহির্গত হইয়া সমস্ত লোকের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে মিশিয়া গেল।

অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, পরম্পরায় মহাভারতের কাহিনী শুনিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রন্থকার আন্দাজে অনুমানে তাঁহার গ্রন্থে অন্যপ্রকার লিখিয়াছেন। তাহাতেই এত বিপর্য্যয় ও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ে—

কালযবন সৈন্যসহ মথুরা পুরীতে আগমন করিলে, কৌশলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে মুচুকুন্দের আশ্রমে লইয়া গিয়া, তাঁহা দ্বারা তাহার বিনাশ করাইলেন। অনন্তর তিনি স্বপুরে আসিয়া যবন-সৈন্য ধ্বংসপূর্ব্বক বলদেব-সহ তাহাদিগের ধনরত্ন সমস্ত লইয়া দ্বারকায় যাইতেছিলেন, এমন সময়ে মগধরাজ জরাসন্ধ ত্রয়োবিংশতি অনীকিনীর অধিপতি হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিতে আসিলেন। তদ্দর্শনে কৃষ্ণ বলরাম পলাইয়া গিয়া পর্ব্বতে লুকাইলে, জরাসন্ধ অগ্নি জ্বালিয়া সেই পর্ব্বত পোড়াইতে আরম্ভ করিলেন। তখন কৃষ্ণ-বলরাম লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক একাদশ যোজন নিম্নভূমিতে পতিত হইয়া সমুদ্রবেষ্টিত দ্বারকা নগরীতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু জরাসন্ধ কিংবা তাঁহার সৈন্যাদি, কেহই ইহা জানিতে না পারাতে, তাঁহারা পর্ব্বতের অগ্নিতে পুড়িয়া মরিয়াছেন ভাবিয়া বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই প্রস্তাবের কোন্ কথায় ভগবানের নির্ম্মল যশ বর্ণনা করা হইল? যবনদিগের ধনরত্ন অপহরণ করায়, না জরাসন্ধের ভয়ে পলাইয়া যাওয়ায়, না লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক একাদশ যোজন নিম্নে পতিত হওয়াতেও মৃত্যু না হওয়ায়? এই সমস্ত কাল্পনিক বর্ণনা দ্বারা ভগবানের বিশুদ্ধ চরিত্রে এবং অতুল পরাক্রমে কলঙ্ক করা হইয়াছে কি না?

হরিবংশের সপ্তনবতিতম অধ্যায়ে, গোমন্ত পর্ব্বতে জরাসন্ধের অগ্নিপ্রদান করা ও অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করার কথা আছে বটে, কিন্তু কৃষ্ণ-বলরাম যে যবন-সৈন্য বিনষ্ট করিয়াছিলেন, কি প্রাণভয়ে পলাইয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে এমন কোনও প্রসঙ্গ নাই;—আছে যবনসৈন্য গ্রহণ করার কাহিনী।

হরিবংশের ত্রিনবতিতম অধ্যায়ে দেখা যায়, রাজমন্ত্রী বিকদ্রু বিশেষ চিন্তা করিয়া উগ্রসেন ও বসুদেবের সাক্ষাতে কৃষ্ণ-বলদেবকে কহিলেন, জরাসন্ধ আসিয়া বারংবার মথুরা অবরোধ করিতেছেন; মথুরায় কোন দুর্গ নাই, দ্বার সকল বিশৃঙ্খল এবং সৈন্য-সংখ্যাও অত্যল্প। এ

অবস্থায় এই নগরে শত্রুসৈন্য প্রবেশ করিলে আমাদের রাজ্য, জন-সমূহের সহিত বিনষ্ট হইবে। পুরবাসী যাহারা আছে, তাহারা প্রাণের আশঙ্কায় দ্বিধাকৃত হইতে উদ্যত হইয়াছে। জরাসন্ধ কেবল তোমার জন্যই মথুরা অবরোধ করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া থাকেন। এই বলিয়া তিনি যদুবংশের ইতিহাস কহিলেন এবং যদুর চারি পুত্র যে পর্ব্বত ইত্যাদিতে পুরী নির্ম্মাণ ও রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সবিস্তারে তাহাও কীর্ত্তন করিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, বলদেব সহ আমরা দুই ভ্রাতা মথুরা পরিত্যাগ করিয়া করবীরপুর, ক্রৌঞ্চপুর এবং গোমন্ত দর্শন করিতে যাইব। আমাদের বহির্গমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিলে জরাসন্ধ পুর-প্রবেশ না করিয়া অনুচরবর্গের সহিত নিশ্চয়ই আমাদিগের অন্বেষণে সহ্যবনে যাইবেন এবং আমাদের গ্রহণ বিষয়ে যত্ন করিবেন। অতএব আমাদিগের এই নির্গমনই আমাদের এবং যদুবংশের পক্ষেও শ্রেয়স্কর। ইহাতে দেশ, নগর ও পৌরগণের মঙ্গল হইবে। শত্রু পলায়ন করিলে, বিজিগীষু নরপতি শত্রুক্ষয় না করিয়া ক্ষান্ত হন না'।

তাহার পর কৃষ্ণ-বলদেব দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থানপূর্ব্বক সহ্যপর্ব্বতে আরোহণ করিলেন এবং যাইতে যাইতে পরশুরামকে প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বিবিধ প্রকার উপদেশ দিয়া হোম-ধেনুর দুগ্ধ পান করাইলেন ও গোমন্ত পর্ব্বতে আরোহণ করিতে বলিয়া নিজে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর কৃষ্ণ-বলদেব গোমন্ত পর্ব্বতের অতি উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

হরিবংশের অষ্টনবতিতম অধ্যায়ে—

জরাসন্ধ নৃপতি বহুসংখ্যক সৈন্য ও স্বপক্ষীয় রাজগণ সমভিব্যাহারে যে সময়ে গোমন্ত পর্ব্বত বেষ্টন করিয়া অগ্নি প্রদান করিলেন, তখন কৃষ্ণ-বলদেব সেই বিপুল-পরাক্রম, সংখ্যাতীত শত্রুসৈন্য মধ্যে পর্ব্বত হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে দলন করিতে লাগিলেন ; চক্র, গদা, হল প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা অগণিত সৈন্য, হস্তী, অশ্ব, রথ, রথী বিনষ্ট করিলেন। বলদেব সমরে জরাসন্ধকে বধ করিতে সমুদ্যত হইলে, বিধাতা অদৃশ্যরূপে আকাশে থাকিয়া কহিলেন যে, অন্যের হস্তে শীঘ্রই জরাসন্ধের মৃত্যু হইবে।

জরাসন্ধ তোমার বধ্য নহে ; তুমি ক্ষান্ত হও। এই দৈববাণী শুনিয়া বলদেব বিরত হইলেন, জরাসন্ধও ভয়-ব্যাকুলিত-চিত্তে প্রস্থান করিলেন। হতাবশিষ্ট রাজগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই পলাইয়া গেলেন। তৎপর চেদিরাজ রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কহিলেন, হে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ! তোমরা আমার স্নেহের পাত্র। আমি তোমাদের পিতৃষ্বসাকে বিবাহ করিয়াছি। আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও, দুর্ম্মতি জরাসন্ধ বারংবার তোমার সঙ্গে বৈর করিতেছে। যাহা হউক, আমি আর ঐ নির্ব্বোধের সহায়তা করিব না। আমি তাহার সপক্ষতা পরিত্যাগ করিলাম। এইক্ষণে চল, সন্নিহিত করবীর পুরে রাজা শৃগালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে মধুর বাক্যে আপ্যায়িত করিয়া চেদিরাজ-প্রদত্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক পথে ত্রিরাত্র অতিবাহিত করিলেন এবং চতুর্থ দিবসে করবীর পুর প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা শৃগাল তাঁহাদের আগমনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও রোষপরবশ হইয়া দেবদত্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের উপরে বহুপ্রকারের অস্ত্র প্রহার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ সমস্তই সহ্য করিয়া, পরে চক্র দ্বারা তাহাকে নিহত করিলেন এবং তৎপুত্রকে ঐ রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াও পিতৃসিংহাসনে বসাইয়া, যুদ্ধনির্জ্জিত রথে আরোহণান্তে দমঘোষের সহিত প্রস্থান করিলেন। অতঃপর তাঁহারা পথে একরাত্রের ন্যায় পঞ্চরাত্র অতিবাহিত করিয়া মথুরায় উপনীত হইলেন। তখন উগ্রসেন প্রভৃতি আসিয়া তাঁহাদিগকে স্বপুরে লইয়া গেলেন। কিছুদিন মথুরায় অবস্থানের পর শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব এবং গরুড়ের সঙ্গে মন্ত্রণাপূর্ব্বক দ্বারকায় পুরী নির্ম্মাণ করত পুত্রকলত্রাদি সহ তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে জরাসন্ধ কিরূপে কৃষ্ণ-বলদেবকে বিনষ্ট করিবেন, তাহারই চিন্তা ও স্বপক্ষীয় রাজগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, যবনাধিপতি অতুলপরাক্রম মহারাজ কালযবনের নিকটে রাজসত্তম শাল্বকে প্রেরণ করিলেন। শাল্ব যাইয়া বলিলেন, হে যবনাধিপ! রাজেন্দ্র মগধরাজ আপনাকে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। পরম দুর্জ্জয় কৃষ্ণ-বলদেব জগৎকে পীড়া দিতেছেন। তাহা শুনিয়া আমি বহু সৈন্য ও রাজগণ সমভিব্যাহারে গমন

করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াও তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলাম না। অবশেষে গোমন্ত পর্ব্বতে অগ্নিপ্রদান করিলে, প্রবল পরাক্রান্ত বাসুদেব বলদেবের সহিত লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক আমাদিগের সৈন্য মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া, প্রথমে আমাদেরই হস্তী, অশ্ব, রথ উত্তোলন ও নিক্ষেপ দ্বারা বহু সৈন্য সহ হয় হস্তীর প্রাণ সংহার করিয়া, পরিশেষে আয়ুধ-গ্রহণে চক্র, গদা, হল ও মুষল দ্বারা আমাদিগকে বিমর্দ্দন করিয়াছেন। আমরা নিতান্ত পরাস্ত ও পরাভূত হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। আপনি যুদ্ধদুর্ম্মদ বীরদ্বয়কে সংহার করিয়া আমাদিগের প্রীতি বর্দ্ধন করুন। উহাঁদিগকে সংহার করিতে আপনিই সক্ষম।

কালযবন কহিলেন, হে মহাবাহো! অসংখ্য রাজগণ যখন আমাকে কৃষ্ণনিগ্রহের নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছেন, তখন আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। রাজগণ যখন হৃষ্টান্তঃকরণে আমার জয় অবধারণ করিয়াছেন, তখন আমি অবশ্যই জয়লাভ করিব; আমি প্রস্তুত হইতেছি। এই বলিয়া তিনি আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনায় ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদিগকে প্রভূত ধন দান করিলেন এবং বিধানানুসারে অগ্নিতে হোম ও আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

কালযবন নিতান্ত ধার্ম্মিক, সত্য-ধর্ম্মনিরত, অতুল-পরাক্রমশালী এবং সমস্ত মহীপালগণের, বিশেষতঃ দৈববলে অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণের অজেয় ছিলেন। তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করার কোনই উপায় ছিল না।

যদুপ্রবীর শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, কালযবন ক্ষমাপরবশ হইবেন না, তখন তিনি ঘোররূপ সুমহান্ একটী কৃষ্ণসর্প কলসে ভরিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলেন এবং দূত দ্বারা সেই সর্প-পূর্ণ ঘট যবনরাজের সন্নিধানে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে দূত যবনরাজের নিকটে গমন করিয়া কহিল, "শ্রীকৃষ্ণ কালসর্প সদৃশ"; এই কথা কহিয়া সেই ঘট প্রদান করিল। যাদবগণ যে তাঁহাকে ভয়প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই এইরূপ করিয়াছেন, কালযবন ইহা বুঝিতে পারিয়া প্রচণ্ড পিপীলিকা সকল দ্বারা সেই কলস পূর্ণ করিলেন। তাহাতে সেই সর্প অসংখ্য তীক্ষ্ণতুণ্ড

পিপীলিকা দ্বারা ভক্ষিত ও ভস্মীভূত হইয়া গেল। তৎপরে কালযবন সেই কলস মুদ্রাঙ্কিত করত বহুল বর্ণনা সহকারে কৃষ্ণের নিকটে পুনঃ প্রেরণ করিলেন।

বাসুদেব স্বপ্রেরিত যোগের কাবযবন-বিহিত প্রতিযোগ দর্শনে সত্বরে মথুরা পরিত্যাগ করত দ্বারকায় গমন করিলেন এবং বৃষ্ণিবংশীয়গণকে আশ্বস্ত করিয়া বৈরি-সংহারের নিমিত্ত কেবলমাত্র সাহস সহকারে সুনীতি-অবলম্বী হইলেন। যেরূপ আকাশকে কেহ লঙ্ঘন কিংবা পরিমাণ করিতে পারে না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নীতি এবং অগাধ বুদ্ধিরও কেহ ইয়ত্তা করিতে পারিত না।

যবন রাজা বিপুল সেনায় পরিবৃত হইয়া মথুরায় যাত্রা করিলেন। এদিকে যবন রাজার আগমন লক্ষ্য করিয়া বাসুদেবও বাহুরূপ প্রহরণের সাহায্যে মথুরায় আসিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। কালযবন তাঁহাকে দেখিয়া হৃষ্ট এবং পরে রোষ সহকারে তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। মান্ধাতৃ-তনয় রাজা মুচুকুন্দ যে স্থানে যে কারণে নিদ্রিত রহিয়াছেন, দেবর্ষি নারদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ কখনও তাহা সম্যক্ অবগত হইয়াছিলেন। সেই মহাত্মা দেবগণের সাহায্যার্থ দৈত্যযুদ্ধে জয়লাভ করাতে দেবগণ সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে বারংবার বরগ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। রাজা মুচুকুন্দও দৈত্যযুদ্ধে ক্লান্ত হওয়াতে, বারংবারই যাহাতে দীর্ঘ নিদ্রা যাইতে পারেন এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে জাগরিত করিবে, রোষচিত্তে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে, সেই ব্যক্তি যাহাতে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়, এই বর চাহিয়াছিলেন। দেবগণ 'তাহাই হইবে' বলিয়া বর প্রদান করেন। তদবধি তিনি সেই দেবদত্ত-বর-প্রভাবে পর্ব্বতগুহায় নির্জ্জন স্থানে শয়ান রহিয়াছেন। নীতিবিশারদ শ্রীকৃষ্ণ, যবন রাজার সঙ্গে অস্ত্রযুদ্ধ না করিয়া, মল্লযুদ্ধ করার অভিপ্রায় প্রকাশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়ায়, যবনরাজ তৎপ্রতি ধাবিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্রুতবেগে পদচারণ করিয়া যেস্থানে মহাত্মা মুচুকুন্দ নিদ্রিত আছেন, সেই দিকেই চলিলেন। যবন রাজাও তাঁহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। যাইতে যাইতে মুচুকুন্দ রাজা যেস্থানে শয়ান রহিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ অতি সাবধানে সেই স্থানে যাইয়া, সেই মহাত্মার দৃষ্টিপথ অতিক্রমপূর্ব্বক তাঁহার শিরোদেশের অন্তরালে লুক্কায়িত রহিলেন। যবন রাজাও গুহায় প্রবেশ করিয়া কেশবের

অদর্শনে রোধপরবশ হইয়া রাজা মুচুকুন্দকে দৃঢ়রূপে পদাঘাত করিলেন। তাহাতেই মুচুকুন্দ জাগরিত হইয়া ক্রোধ-দৃষ্টিতে যবন রাজাকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন।

বাসুদেব বুদ্ধিবলে এইরূপ কৃতকার্য্য হওয়াতে নিরতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন এবং মহীপতি মুচুকুন্দের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! দেবর্ষি নারদের নিকট শুনিয়াছি, আপনি বহুকাল নিদ্রিত ছিলেন। যাহা হউক, আপনি আমার মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন; আপনার মঙ্গল হউক। আমি যাইতেছি। রাজা মুচুকুন্দ হ্রস্বপ্রমাণ বাসুদেবকে দেখিয়া ভাবিলেন, আমি বহুকাল নিদ্রিত ছিলাম। ইহার মধ্যে যুগ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। অনন্তর সেই নৃপসত্তম কেশবকে বলিলেন, আপনি কে, কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন? আমি কত কাল নিদ্রিত ছিলাম, ইহা যদি আপনার জানা থাকে, তবে বলুন। বাসুদেব বলিলেন, চন্দ্রবংশে নহুষ-নন্দন যযাতি নামে নরপতি ছিলেন। যদু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং তুর্ব্বসু প্রভৃতি আর চারিজন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। হে বিভো! আমাকে সেই যদুর বংশে সমুৎপন্ন বসুদেবনন্দন বাসুদেব বলিয়া জানিবেন। আমি কার্য্য বশতঃ আপনার নিকট আসিয়াছিলাম। হে রাজন্! আমি নারদের নিকট শুনিয়াছি, আপনি ত্রেতাযুগে প্রসুপ্ত হইয়াছিলেন; সম্প্রতি কলিযুগ প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমি আপনার কোন্ কার্য্য করিব, বলুন। হে নৃপ! আমি শত বৎসর যুদ্ধ করিয়াও যে শত্রুকে সংহার করিতে পারিতাম না, আপনি দেবদত্ত-বর-প্রভাবে তাঁহাকে দগ্ধ করিয়াছেন।

রাজা মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া গুহামুখ হইতে নির্গত হইলেন; ধীমান্ বাসুদেবও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। নৃপতি বহির্গত হইয়া দেখিলেন, অল্পোৎসাহ, অল্পবল, অল্পবীর্য্য, হ্রস্ব-প্রমাণ নরগণে পৃথিবী পরিব্যাপ্তা এবং আপনার রাজ্যও পরকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। রাজা এই সকল দর্শনে তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া, প্রীতি সহকারে বাসুদেবকে বিসর্জ্জন করত হিমালয়ে গমন করিলেন এবং তপস্যা দ্বারা কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় কর্ম্মবলে সুরপুরে আরূঢ় হইলেন।

মহামনা ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব যবন-সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রভূত-রথ-হস্তি-

অশ্বসমন্বিত সেই নিহত যবন রাজার সৈন্যগণকে লইয়া প্রস্থিত হইলেন। অতঃপর তিনি রাজা উগ্রসেনকে সেই চতুরঙ্গিণী বাহিনী প্রদান করত জয়-লব্ধ ধন দ্বারা দ্বারকাকে শোভিত করিলেন। যবন রাজার সেনাগুলি মথুরায় রাখিয়া গেলেন ; বধ করেন নাই। ইত্যাদি।

ভগবান্ বাসুদেবের এই যে সুমহৎ নির্ম্মল যশ রাজনীতির আদর্শরূপে হরিবংশে বর্ণিত রহিয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থকার তাহা রূপান্তরে—অতি বিপর্য্যয়ে লিখিয়া একবারেই মাটি করিয়া ফেলিয়াছেন। তবে তিনি মুচুকুন্দ-কৃত ভগবানের স্তব লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু স্তব দ্বারা যশঃকীর্ত্তন হয় না ; মহৎ কার্য্য দ্বারাই যশ প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থকার হইলে, হরিবংশে ভগবানের যে মহৎ যশ নিহিত রহিয়াছে, তিনি কখনই তাহার ধ্বংস করিয়া, তদ্বিপর্য্যয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে এই প্রস্তাব লিখিতেন না। তাহার পর এই প্রসঙ্গ একবার হরিবংশে লিখিয়া, তিনি আবার কেন শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিলেন ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ে—

কংসপ্রেরিত পূতনা, অঘাসুর, বৎসাসুর, কংস-সখা বকাসুর, তৃণাবর্ত্তাসুর, ধেনুকাসুর, প্রলম্বাসুর ও শঙ্খচূড়াসুর প্রভৃতিকে কৃষ্ণ-বলদেব বিনষ্ট করিলেন। তাহার পর কিন্তু কংস আর কিছুই করিলেন না। একদিন নারদ মুনি আসিয়া কংসকে কহিলেন, দেবকীর অষ্টম গর্ভে যে কন্যা হয়, সে যশোদার কন্যা। কৃষ্ণ-বলরাম, দেবকী এবং রোহিণীর তনয়। বসুদেব ভয় পাইয়া তাঁহার মিত্র নন্দের নিকটে উহঁাদের দুইজনকেই রাখিয়া আসিয়াছেন। উহঁাদের উভয় ভ্রাতার হস্তে তোমার চরগণের মৃত্যু হইয়াছে। নারদ-মুখে ভোজপতি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং বসুদেবকে সংহার করিবার জন্য শাণিত খড়্গ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু নারদ মুনি বারণ করাতে তাঁহাকে বধ না করিয়া লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া রাখিলেন।

গ্রন্থকার নারদকে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে পুনঃপুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন এবং বসুদেব যে তাঁহার পুত্রদ্বয়কে নন্দের গৃহে রাখিয়াছেন, ইহা জানিয়াই কংস পূতনা প্রভৃতিকে পাঠাইয়া তাঁহাদের বিনাশের চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহাও শ্রীমদ্ভাগবতেরই লেখা। তবে গ্রন্থকার দশম স্কন্ধের ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ে কংসের নিকটে নারদ মুনিকে উপস্থিত করিয়া তাঁহারই পূর্ব্ব বর্ণনা রদ ও বাতিল করিলেন। ইহাই কি ব্যাসদেবের লেখা? কেশব যে কংস-প্রেরিত প্রধান প্রধান সৈন্যগুলিকে নিহত করিয়াছেন, কংসজী কি তাহা জানিতে পারেন নাই? নারদ কি ধর্ম্মবিদ্বেষী ছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের নিরীহ পিতামাতাকে বধ করিতে বা কষ্ট দিতে কংসকে ঐরূপ সংবাদ দিয়াছিলেন? বস্তুতঃ যে গ্রন্থে পূর্ব্বাপর এইরূপ বিপর্য্যয়, সেই গ্রন্থ কখনই ব্যাসকৃত নহে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়ে—

শ্রীকৃষ্ণের মহিষীকরণ সংবাদে।

শ্রীকৃষ্ণ কোশল দেশের রাজ-কন্যা নাগ্নজিতীকে বিবাহ করিলে কন্যার জনক যৌতুক ব্যবহারে পদককণ্ঠী সুবেশা ত্রিসহস্র যুবতী পরিচারিকা, দশ সহস্র ধেনু, নয় সহস্র হস্তী, নয় লক্ষ রথ, নব কোটী অশ্ব এবং নয় পদ্ম দাস নব-দম্পতীকে প্রদান করিয়া অপরিসীম আনন্দিত হইলেন।

পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, সমগ্র ভারতবর্ষে ২৪।২৫ কোটী লোকের অধিক হইবে না; এই অবস্থায় কোশল দেশ কত বড় এবং রাজারই বা কত পদ্ম দাস ছিল যে, তিনি তাহা হইতে নয় পদ্ম দাস কন্যা ও জামাতাকে যৌতুক দিয়া ফিলিলেন। পদ্ম পরিহাসের কথা নহে; উহার উপরে কিন্তু আর গণনাই নাই। তাহার পর রাজা যে ৯ পদ্ম দাস, ৯ লক্ষ রথ, ৯ কোটি অশ্ব, ৯ সহস্র হস্তী, ১০ সহস্র গাভী ও ৩ সহস্র দাসী দিয়াছিলেন, তাহা দ্বারকার মত অতটুকু দ্বীপে স্থান পাইল কিরূপে? কোশল দেশেই বা এতগুলি পশু ও দাস-দাসীর কি প্রকারে সমাবেশ হইত?

এই সমস্ত কথাগুলি নিতান্তই অসম্ভব ও অমূলক; সুতরাং ইহা কখনই ব্যাসকৃত রচনা বলিয়া অনুমিত হইতে পারে না।

নবম পরিচ্ছেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে—
রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সংসার-ত্যাগ।

বিদুর তীর্থ-দর্শন ও পৃথিবী পর্য্যটনপূর্ব্বক হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন এবং পুরস্থিত সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণাদির পর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর তিনি তাঁহাকে বলিলেন, রাজন্! আর কি দেখিতেছেন? এক্ষণে সংসারের মায়া পরিত্যাগ করুন। যে ভীমসেন আপনার পুত্রদিগকে নিহত করিয়াছে, আপনি কুক্কুরবৎ তাঁহাদেরই অন্নে শরীর পোষণ করিতেছেন! আপনি কি ছিলেন, কি হইলেন! ইত্যাদি বলিয়া আরও কহিলেন, শীঘ্র গৃহ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক যোগাবলম্বনে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হউন, ইত্যাদি।

বিদুরের এবম্ভূত তিরস্কার-বাক্য শ্রবণে রাজা ধৃতরাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ গৃহ ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলেন; গান্ধারী এবং বিদুরও তাঁহার অনুগামী হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রতিদিনই পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নীর চরণ বন্দনা করিয়া থাকেন। সেই দিবস কিন্তু তাঁহাদিগকে না দেখিতে পাইয়া, সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন বটে, বস্তুতঃ তাঁহার কাছে কোনও নিশ্চয় উত্তর পাইতে পারিলেন না। অতঃপর তিনি দেবর্ষি নারদকে সমুপাগত দর্শনে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমার পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী কোথায় গেলেন? নারদ বলিলেন, তাঁহারা হিমালয়ে উপস্থিত হইয়া তপস্যা করিতেছেন, অদ্য হইতে ৫ দিবস মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র দেহ ত্যাগ করিবেন। তুমি বৃথা শোক করিও না, তাঁহাদিগকে আনিবার আর অন্য কোনই উপায় নাই। ইত্যাদি।

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বনগমন, মহাভারতের আশ্রমবাসিক পর্ব্বে বিস্তৃতরূপে লিখিত রহিয়াছে। তাহাতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রস্তাবসময়ে, কি তাহার পরে, বিদুর কখনই তীর্থ কিংবা পৃথিবী-পর্য্যটনে বহির্গত হন নাই, পাণ্ডবদিগের অপ্রিয়, অপ্রীতিকর অথবা প্রতিকূলতা-জনক কোন বাক্য, পুত্রশোক-সন্তপ্ত ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন নাই, তাঁহাকে বনগমনে বা সংসার-পরিত্যাগে প্রোৎসাহিত

করেন নাই এবং বনে যাইয়া তপস্যা করিতেও প্রবৃত্তি দেন নাই। ধৃতরাষ্ট্রও যুধিষ্ঠিরের অজ্ঞাতসারে পলাতকের ন্যায় বনবাসী হন নাই।

মহাভারতে আছে, কুরুক্ষেত্র-সমর-সমাধার পর, পাণ্ডব ও পাণ্ডব-মহিলাগণ পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে পিতামাতা নির্ব্বিশেষে সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব কালে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার অনুমতি-গ্রহণে স্বেচ্ছামত দান ও যজ্ঞাদি করিতেন। তাহার পর বার্দ্ধক্য বশতঃ বৃদ্ধ রাজার নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি ১৫ দিবস পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরকে সবিশেষরূপে বলিয়া এবং ব্যাসদেবের সাহায্যে বনগমনে তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক মৃত মহারথী পুত্রগণের তৃপ্তিজন্য যুধিষ্ঠিরের মত লইয়া ক্রমান্বয়ে একাদশ দিবস পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণপ্রভৃতিকে ধন, রত্ন, গ্রাম, হস্তী, অশ্ব-আদি দান, তৎপরে আত্মসফলতার নিমিত্ত দানাদি করিয়া, অবশেষে বনে গমন করিলেন। তৎকালে পুরস্থিত সকলেই তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কতক দূর যাইয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সুভদ্রা-আদি মহিলাগণ ফিরিয়া বাড়ী আসিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী কুন্তীদেবী, মহাত্মা বিদুর এবং মহামতি সঞ্জয় আর ফিরিলেন না। কুন্তীদেবী যখন কোন মতেই বনগমনে নিবৃত্ত হইলেন না, তখন মাতা ও পিতৃব্যাদির শোকে যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ এবং দ্রৌপদী সুভদ্রা-আদি মহিলাগণ কাঁদিয়া ব্যাকুলিত হইলেন। কিছুদিন পরে মাতা এবং পিতৃব্য-পিতৃব্যপত্নীদিগের শোকে ও বিরহে তাঁহারা সসাগরা বসুন্ধরার ভোগসুখে তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া, যুযুৎসুকে মাত্র বাড়ীতে রাখিয়া সমস্ত মহিলাগণ সমভিব্যাহারে গুরুজন-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বনে প্রস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদের দেখা পাইলেন। ইত্যাদি।

উভয় গ্রন্থে যখন এত বৈষম্য, এত পার্থক্য রহিয়াছে, তখন ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতের গ্রন্থকার কস্মিন্‌কালেও এক ব্যক্তি হইতে পারে না।

দশম পরিচ্ছেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে—
যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ।

আত্মবিরোধে যদুবংশ বিনষ্ট হইলে, শ্রীকৃষ্ণ দেহ ত্যাগ করিলেন। অতঃপর কৃষ্ণ-মহিষীদিগকে লইয়া অর্জ্জুনের হস্তিনায় গমন সময়ে, পথে কতক-গুলি নিকৃষ্ট গোপজাতি উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া গেল। তখন অর্জ্জুন বহু চেষ্টাতেও ধনুর্ব্বাণ চালাইতে অক্ষম হইয়া মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার তেজ হরণ করিয়া লইয়াছেন। তদনন্তর তিনি হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় পূর্ব্বে যে সকল উৎকট কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা একে একে পুরবাসীদের নিকট বর্ণনাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের সংবাদ বলিয়া ফেলি-লেন। দেবী কুন্তী, তাহা শ্রবণমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে মন অর্পণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার পর যুধিষ্ঠির হৃদয়ে কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে যোগ ও মৌন-ব্রতাবলম্বনে পুরত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং দ্রৌপদী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ইহাই রাজা যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ।

মহাভারতে কিন্তু কুন্তী দেবীর মৃত্যু শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের বহুদিন পূর্ব্বে এবং তপোবনে হইয়াছে,—স্বপুরে হয় নাই। প্রমাণ, মহাভারতের আশ্রম-বাসিক পর্ব্বের সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ে।

জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, পিতৃব্য-পত্নী গান্ধারী এবং জননী কুন্তীর বনগমনের বহুদিন পরে, পাণ্ডবগণ অন্তঃপুরস্থ সমস্ত মহিলাগণ-সমভিব্যাহারে তপোবনে যাইয়া, এক মাসের অধিক কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিকট অবস্থানপূর্ব্বক স্বগৃহ হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার দুই বৎসর পরে এক দিবস নারদমুনি আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, রাজন্! ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, গঙ্গা-দ্বারের নিকটে কোনও অরণ্যে যাজক-ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক বনে নিক্ষিপ্ত সেই যজ্ঞাগ্নিতেই আপনার পিতৃব্য, পিতৃব্যপত্নী এবং মাতা-ঠাকুরাণী সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। সঞ্জয় মাত্র আত্মরক্ষা করিয়া হিমালয়ে চলিয়া গিয়াছেন।

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কুন্তীদেবীর স্বপুরে মৃত্যু হওয়ার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে কোথা হইতে কেমন করিয়া আনা হইল, তাহা বুদ্ধির অগম্য। কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমানেই পরলোক গমন করিলেন বনবাসে—অগ্নিতে ; শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিলেন, কৃষ্ণের শোকে, স্বপুরে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ মহর্ষি-কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত নয়। শ্রীমদ্ভাগবতকার প্রকৃত ঘটনা মহাভারতে কি আছে, না আছে, তাহাও বোধ হয় জানিতেন না এবং অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই।

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ যে কুন্তীর ভ্রাতৃনন্দন, তাহাও তাঁহার বিদিত ছিল না। যদি তাহাই থাকিবে, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে মন সমর্পণপূর্ব্বক কুন্তীদেবীর প্রাণ পরিত্যাগ করিবার কথা কখনই তিনি লিখিতেন না কিংবা লিখিতে শ্রীমদ্ভাগবতকারের সাহসেই কুলাইত না। বস্তুতঃ বাৎসল্য ভাবে যেরূপ সান্নিধ্য লাভ করা যায়, ভক্তিভাবে তত নয়। তবে যদি ভগবানের মাহাত্ম্যবিস্তার জন্য তিনি পিসীর মন ভাই-পোর পাদপদ্মে ঢলাইয়া থাকেন, তাহা হইলে সে বিষয়ে কথা নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও বিচিত্র কথা এই যে, দ্বারকা হইতে প্রত্যাগত অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার পারিবারিক অবস্থা শুনিতে অভিলাষী হইয়া, রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাকুলিত-চিত্তে যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি তন্মূহূর্ত্তেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষানুরূপ উত্তর না দিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে পাণ্ডব-দিগকে অশেষ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, একটী একটী করিয়া যুধিষ্ঠিরকে তাহাই শুনাইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির কিন্তু শুনিতে চাহিয়াছেন, যাহা তিনি ইতঃপূর্ব্বে শুনেন নাই। অর্জ্জুন, যাহা বলা উচিত, তাহা না বলিয়া যুধিষ্ঠির যে সব কাহিনী জ্ঞাত আছেন, সবিশেষরূপে তাঁহাকে তাহাই বলিতে লাগিলেন এবং তাহার পরিসমাপ্তির পর যদুকুলের ক্ষয় ও শ্রীকৃষ্ণের পরলোক-গমন সংবাদ জানাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় প্রতাপে ও অপরিসীম সাহায্যে পাণ্ডবগণ যে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন ও যে সমস্ত ফল লাভ করিয়াছেন, অর্জ্জুনের গুরুজন ধর্ম্ম-পরায়ণ যুধিষ্ঠির কি তাহা জানিতেন না ? তবে আর অর্জ্জুন অকৃতজ্ঞ মনে করিয়া স্বমুখে কৃষ্ণকৃত উপকার বর্ণনাপূর্ব্বক তাঁহাকে

কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইলেন কেন ? বাস্তবিক অর্জ্জুনের এ উদ্দেশ্য নিতান্তই অস্বাভাবিক। সুতরাং এই গ্রন্থ কদাপি ব্যাসকৃত হইতে পারে না।

মহাভারতের মৌষলপর্ব্বে আছে, ব্রহ্মশাপ হেতু মুষলপ্রভাবে যদুবংশ ধ্বংস হইলে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের জন্য দূত প্রেরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। অর্জ্জুন আসিয়া সকলের শব-দাহাদি কর্ম্ম-অন্তে যাবতীয় ধনরত্ন, মহিলাগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের একটী শিশু পৌত্রকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। অতঃপর (মহাপ্রাস্থানিকপর্ব্বে) শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগের সহিত মহাপ্রস্থানে সমুদ্যত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পৌত্রকে ইন্দ্রপ্রস্থের ও পরীক্ষিৎকে হস্তিনা-নগরের অধীশ্বর নির্দ্দেশ করত, যুযুৎসুর উপরে তাহাদের রাজ্যরক্ষার ভার, কৃপাচার্য্যের হস্তে ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষার ভার এবং সুভদ্রার প্রতি শিশু দুইটীর পরিরক্ষণ-ভার সমর্পণপূর্ব্বক ভীমাদি ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় ও দ্রৌপদী-সমভিব্যাহারে মহাপ্রস্থান করিলেন। তাঁহারা হিমালয় পর্ব্বত ছাড়াইয়া যে সময়ে মহাশৈল সুমেরু-শিখরে উপস্থিত হইতেছিলেন, তখন পাপ-নিবন্ধন পড়িতে পড়িতে যোগভ্রষ্ট হইয়া সকলেই ভূতলে পড়িয়া গেলেন, মাত্র একাকী যুধিষ্ঠিরই জীবিত রহিলেন।

স্বর্গারোহণ পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ-বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত।

উদ্ধব-বিদুর-সংবাদে—

কুরু-পাণ্ডবদিগের সন্ধি-স্থাপনের নিমিত্ত বিদুর অন্ধরাজকে যে সকল হিতকর বাক্য বলিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন তাহা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বিদুরের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। বিদুর পূর্ব্বেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ পর্য্যটনপূর্ব্বক যে সময়ে প্রভাস-তীর্থে উপস্থিত হইলেন, তখনই তিনি জানিতে পারিলেন, যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সাহায্যে এই পৃথিবীকে একচক্রা, একচ্ছত্রা করিয়া শাসন করিতেছেন, কুরুগণ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ মানব-লীলা সংবরণ করিয়াছেন; কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের অস্তগমনে জগৎ অন্ধকার।

তাহার পর বিদুর উদ্ধবের নিকটে শুনিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছিলেন এবং মৈত্রেয় মুনির সমীপে গেলেই তিনি কৃষ্ণ বিষয়ক সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে পারিবেন। সেই উপদেশানুসারে কয়েক দিন ইতস্ততঃ পরিভ্রমণের পর বিদুর ভাগীরথীর তীরে মৈত্রেয় মুনির নিকটে উপস্থিত হইয়া, শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের শেষাংশ হইতে চতুর্থ স্কন্ধের শেষ পর্য্যন্ত পরম ভাগবত-তত্ত্ব যাহা কিছু আছে, সমস্তই শ্রবণ করিয়া হস্তিনা-পুরে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে মহাভারতে দেখা যায়, বিদুর সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, তপস্যা-নিরত, ধার্ম্মিক, শাস্ত্রজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত এবং ধৃতরাষ্ট্রের প্রিয়তম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। অন্ধরাজ তাঁহাকে চক্ষুঃস্বরূপ সতত নিকটে রাখিতেন, মুহূর্ত্তের জন্য তিনি কাছে না থাকিলে দিশাহারা হইয়া যাইতেন। ইহা উদ্যোগপর্ব্বে, কর্ণপর্ব্বে ও শল্যপর্ব্বে বিশিষ্টরূপে লিখিত রহিয়াছে। বিদুরের সত্যের বল এত ছিল যে, দুর্য্যোধন কখনই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বনপর্ব্বের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে লেখে, পাণ্ডবগণের সপক্ষ বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র

একবার বিদুরকে পরিত্যাগ করাতে তিনি বনে যাইয়া তাঁহাদের° নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই এই ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ-জ্বালা ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল, তিনি ভ্রাতার জন্য শোক করিতে করিতে অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সঞ্জয়কে কহিলেন, সঞ্জয়! আমি ভ্রাতৃবিরহে কোন ক্রমে প্রাণ-ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না; তুমি সত্বর যাইয়া বিদুরকে আনয়ন কর। নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব। অতঃপর সঞ্জয়কর্ত্তৃক বিদুর আনীত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে অনঘ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার যাবতীয় তিরস্কার-বাক্য বিস্মৃত হও, ইত্যাদি।

ইহার পরে অন্ধ-রাজ আর কখনই বিদুরকে প্রত্যাখ্যান করেন নাই। ধৃতরাষ্ট্র বর্ত্তমান সত্ত্বে বিদুর দুর্য্যোধনকে কিছুমাত্র ভয় করিতেন না, দুর্য্যোধন কস্মিন্‌কালেও সর্ব্বস্ব কাড়িয়া আনিয়া বিদুরকে দূর করিয়া দেওয়ার মন্ত্রণা করেন নাই এবং বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে পরিত্যাগ করিয়া কোন দিনও কোন তীর্থে যান নাই।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদুর অন্ধরাজকে বহুবিধ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অন্ধরাজের নিকটে বিদুরের অতি-উচ্চতর প্রতিপত্তি ছিল। সুতরাং দুর্য্যোধনের কি ক্ষমতা ছিল যে, তিনি বিদুরকে তাড়াইয়া দেওয়ার কথা মুখে আনিতে পারেন? সন্ধি করিবার অভিপ্রায়ে মহাত্মা কেশব পাণ্ডবদিগের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক যে সময়ে হস্তিনায় আসিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে উপস্থিত হন, তখন দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাঁহাকে সহায়হীন বিবেচনা করিয়া বন্ধন করিতে মন্ত্রণা করিযাছিলেন। কিন্তু বিদুর সেই দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া অন্ধরাজের নিকট ব্যক্ত করাতে, তিনি তাঁহাকে সভায় আনিবার জন্য বিদুরকেই অনুমতি করিলেন। তদনুসারে, দুর্য্যোধনের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বিদুর আনিয়া তাঁহাকে ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে উপস্থিত করেন। অতঃপর অন্ধরাজ, বিদুর এবং শ্রীকৃষ্ণ, দুর্য্যোধনকে কি কি কথা কহিয়াছেন, পাঠকদিগের জন্য অতি সঙ্ক্ষেপে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাই কিন্তু সন্ধির প্রস্তাবের শেষ কথা। মহাত্মা বাসুদেব সন্ধি করিতে অকৃতকার্য্য হওয়াতেই যুদ্ধারম্ভ হয়।

১   উদ্যোগপর্ব্বের ২৭০ পৃষ্ঠায়—

বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে বিদুর, অনিচ্ছু হইলেও দুর্য্যোধনকে পুনরায় সভাগৃহে আনয়ন করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র কর্ণ, দুঃশাসন ও দুর্ব্বৃত্ত ভূপালবর্গে পরিবেষ্টিত সেই দুরাশয় দুর্য্যোধনকে বলিতে লাগিলেন, রে পাপাত্মন্! রে ক্রূরমতে! তুমি নীচ-কর্ম্মানুষ্ঠান-নিরত সহায়গণের সহিত মিলিত হইয়া নিদারুণ পাপকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? রে পাপিন্! শুনিলাম, নরাধমগণের সাহায্যে তুমি নাকি দুর্দ্ধর্ষ বাসুদেবকে নিগৃহীত করিতে সমুদ্যত হইয়াছ? ইত্যাদি গালাগালি ও ভর্ৎসনা।

অনন্তর মহামতি বিদুর রোষপরায়ণ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! যে বাসুদেব বাল্যাবস্থাতেই পূতনা রাক্ষসী প্রভৃতিকে বিনষ্ট করিয়াছেন, যৌবনে যাঁহার হস্তে, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণ পরাজিত হইয়াছেন, তুমি সেই অমিতবিক্রম বাসুদেবকে এপর্য্যন্ত জানিতে পারিলে না? ক্রুদ্ধভুজঙ্গোপম প্রচণ্ড তেজোরাশি অনিন্দিতাত্মা কৃষ্ণকে গ্রহণ করিবার আশয়ে তাঁহার সমীপস্থ হইলে, প্রদীপ্ত পাবকে পতিত পতঙ্গের ন্যায় তোমাকে অমাত্যগণের সহিত প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

বাসুদেব কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি বিবেচনা করিয়াছ আমার সঙ্গে কেহ নাই? কিন্তু তুমি দেখ! এই কথা বলিয়াই তিনি তাঁহার শরীর হইতে ইন্দ্রাদি দেবতা, যদু ও বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ এবং অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবদিগকে সশস্ত্র বহির্গত করিলেন; নিজেও বিশ্বমূর্ত্তি ধরিলেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনাদি ভয়ে মহাভীত ও স্তম্ভিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে ঐ সময়ের জন্য চক্ষু লাভ করিয়া, অন্ধরাজও তাঁহার বিশ্বমূর্ত্তি দর্শনে কৃত-কৃতার্থ হইলেন এবং বহুপ্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মার হস্ত ধারণপূর্ব্বক বহির্গত হইয়া, অন্তঃপুরে কুন্তীদেবীর নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণে পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন।

এ দিকে দুর্য্যোধনেরা কুরুক্ষেত্রে শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক তথায় গমন করিলেন; মহামতি বিদুর ও সঞ্জয়, অন্ধরাজের নিকটেই রহিলেন। সঞ্জয়

কখন কখন সমরদর্শনে যাইতেন ও আসিয়া তাহা অন্ধরাজের নিকটে বিশেষরূপে বর্ণন করিতেন বটে, কিন্তু বিদুর আর কোথাও গমনই করিতেন না।

যুদ্ধের কাল,—ভীষ্মদেবের দশ দিন, দ্রোণাচার্য্যের পাঁচ দিন এবং কর্ণের মাত্র এক দিন। এই একদিনের যুদ্ধেই কর্ণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে, শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে অন্ধরাজ ধরাতলে নিপতিত হইলেন, বিদুর যাইয়া তাঁহাকে অনন্ত প্রকারে প্রবোধবাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন। তাহার পর (শল্যপর্ব্বে) দুর্য্যোধনাদির বিনাশ-সংবাদ শুনিয়াও শোকার্ত্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভূতলশায়ী হইলে, শোকশান্তি জন্য তাঁহাকে প্রবোধ দেওয়া ও তাঁহার সেবা-শুশ্রূষাদি-কর্ম্মে নিয়ত ব্রতী হওয়া বিদুরের কার্য্য হইল। ইহার পর বিদুর, অন্ধরাজকে ফেলিয়া এক মুহূর্ত্তের তরেও স্থানান্তর গমন করেন নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে অন্ধরাজ পনর বৎসর কাল স্বপুরে ছিলেন, মহাত্মা বিদুর তাঁহার নিকটেই ছিলেন; অতঃপরে তিনি যখন বন গমন করিলেন, তখনও গান্ধারী, কুন্তী এবং সঞ্জয়সহ বিদুর তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী। এই বন মধ্যেই, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ যে সময়ে পিতৃব্যপ্রভৃতির দর্শনে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে যুধিষ্ঠিরের সমক্ষেই বিদুর দেহত্যাগ করেন। তবে আর তিনি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পূর্ব্বে কি পরে, অন্ধরাজকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবী ও তীর্থপর্য্যটনে গেলেন কখন? তাহার পর বিদুরের মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় বর্ত্তমান ছিলেন। এ অবস্থায় শ্রীমদ্ভাগবতকার কেমন করিয়া লিখিলেন যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদুর পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন পুর্ব্বক, যে সময়ে পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন, যে সময়ে কৃষ্ণ দেহত্যাগ করিয়াছেন, সেই সময়ে তিনি প্রভাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উদ্ধবের নিকটে, মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিসংবাদ ও মৈত্রেয় মুনির সমীপে যাইয়া ভাগবততত্ত্ব-শ্রবণের উপদেশ শুনিতে পাইলেন? কেবল উপদেশ পাইয়াই বিরত রহিলেন না; দীর্ঘকাল বসিয়া শুনিলেন।

পাঠক! বিবেচনা করিয়া দেখুন;—শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান থাকিতে, বনবাসে মহাভারতের বিদুরের মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর, সেই বিদুর পৃথিবী ও তীর্থ পর্য্যটন করিয়া, প্রভাসে উপস্থিত হইতে ও

উদ্ধবের নিকট ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত কেমন করিয়া শুনিতে পারেন! মৈত্রেয় মুনিকর্ত্তৃকই বা তাঁহার নিকট, ভাগবতের ঐ তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায় হইতে, চতুর্থ স্কন্ধের শেষ পর্য্যন্ত কিরূপে কথিত হইতে পারে? বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণের পার্থিব লীলা-খেলার সময়ই যে বিদুর, পরলোকগত হইলেন, পুনরপি কৃষ্ণতিরোধানের পর কিরূপে সেই মৃত বিদুর আবার উদ্ধব ও মৈত্রেয় মুনির নিকট গিয়াছিলেন! অতএব এই মুখ্য প্রমাণে নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে,—ঐ তৃতীয় স্কন্ধের প্রথম হইতে চতুর্থ স্কন্ধের শেষ পর্য্যন্ত কাল্পনিক ও কৃত্রিম।

শ্রীমদ্ভাগবত খানি একেই ত মূলহীন বৃক্ষ; তাহাতে আবার গ্রন্থকার তাহার শাখায়-প্রশাখায় দিয়াছেন মরা-মানুষ গাঁথিয়া যোড়া। এরূপ গ্রন্থ মহাভারত-গ্রন্থকার পণ্ডিত-চূড়ামণি মহর্ষি বেদব্যাসের নামে কৃত্রিম না করিয়া, শ্রীমদ্ভাগবতকারের স্বীয় নাম প্রকাশ করাই উচিত ছিল। তিনি জগৎপূজ্য মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাম কলঙ্কিত করিতে অহেতুক প্রয়াস পাইলেন কেন?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ে—

পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্ম-শাপ এবং শুকদেবের আগমন।

একদা রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়াকালে ধ্যান-পরায়ণ তপস্যা-নিমগ্ন শমীক নামে কোনও এক মুনির গলায় একটী মৃত-সর্প তুলিয়া দিয়া তাঁহার অপমান করেন। তদ্দর্শনে, তৎপুত্র ক্রোধ-পরবশ হইয়া, সপ্তাহ-মধ্যে তক্ষক নামক সর্পে দংশন করিবে বলিয়া পরীক্ষিৎকে অভিসম্পাত দেন। তখন মুনিবরের ধ্যান-ভঙ্গ হওয়াতে, তিনি ঐ সংবাদ শিষ্য দ্বারা রাজা পরীক্ষিতের নিকট প্রেরণ করিলেন। পরীক্ষিৎ তাহা শুনিয়া, পুত্র জনমেজয়ের হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে গমন করিলেন এবং তথায় গিয়া কুশ-শয্যায় আসীন হইলেন। এমন সময়ে নারদ, ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ সেখানে উপনীত হইলে, রাজা তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অন্তিম সময় নিকটবর্ত্তী হইলে, মানুষের কি করা কর্ত্তব্য? তদুত্তরে কেহ বলিলেন যজ্ঞ, কেহ বলিলেন দান, ইত্যাদি। এইরূপ তর্ক-বিতর্ক হইতেছে, এমনকালে শুকদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজার জিজ্ঞাসিত বিষয় অবগত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত কহিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় হইতে মূল-সূত্র অবলম্বন করিয়া সূত শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে অবশিষ্ট সমস্ত গ্রন্থের পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। ইহারই নাম শ্রীমদ্ভাগবত; অর্থাৎ গঙ্গাতীরে বসিয়া রাজা পরীক্ষিৎ শুকমুখে যে ভাগবততত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন, আনুপূর্ব্বিক তাহাই সূত শৌনকাদি ঋষিগণ সমীপে বলিয়াছেন।

এ বিষয়ে এই প্রস্তাব মহাভারতেরও মূল-সূত্র, উহা আবার শ্রীমদ্ভাগবতেরও মূল-সূত্র হইয়াছে। শমীক-নন্দনের ক্রোধের কারণ, শাপ দেওয়া এবং পরীক্ষিৎকে সংবাদ-প্রদান করা পর্য্যন্ত উভয়-গ্রন্থে প্রায় একরূপ। কিন্তু মহাভারতে দেখা যায়, শাপবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া পরীক্ষিৎ, কখনই অপোগণ্ড

শিশু পুত্র জনমেজয়ের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া গঙ্গাতীরে চলিয়া যান নাই, ঐ সময়ে নারদাদি মুনিগণ ও ব্যাসনন্দন শুক, সপ্তদিন মধ্যে তাঁহার নিকটে সমাগত হন নাই। তাহাতে লিখিত রহিয়াছে, রাজা পরীক্ষিৎ শমীকপুত্রের ক্রোধের কারণ ও শাপের বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও প্রাণভয়ে ব্যাকুলিত হইলেন। তাহার পর তিনি স্বকীয় প্রাসাদের উপরেই একটী সুরম্য-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া, উপযুক্ত প্রহরীর হস্তে রক্ষণ-ভার সমর্পণ-পূর্ব্বক, মন্ত্রিগণ, ব্রাহ্মণগণ, কতিপয় ওঝা, বৈদ্য ও বহুপ্রকার ওষধি সমভিব্যাহারে তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন এবং তথা হইতেই রাজকার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রাণ-ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য ঔষধ-পত্র সহ বৈদ্য, ওঝা, মন্ত্রী এবং ব্রাহ্মণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সতর্ক ও সাবধানতার সহিত স্বভবনস্থ স্তম্ভমধ্যে লুক্কায়িত থাকিলেন। কালের গতি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত; তাই অব্যর্থ-ব্রহ্মশাপ-প্রভাবে, সপ্তম দিবসে ছলে কৌশলে তক্ষক তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দংশন করিল, সেই দংশনেই রাজা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

অতঃপর রাজার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইলে, মন্ত্রিগণ প্রজাদিগের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক শিশু রাজপুত্র জনমেজয়কে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ-কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। ঐ শিশু ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, উতঙ্ক মুনির নিকট তাঁহার পিতার নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা রাজা পরীক্ষিৎ যেরূপে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, যেরূপ সাবধানে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন এবং কশ্যপ নামক ওঝার যেরূপ ক্ষমতা দর্শনে তক্ষক তাঁহাকে বহুমূল্য রত্নাদি উৎকোচদানে রাস্তা হইতে ফিরাইয়া দিয়া, ছলে কৌশলে রাজ-সন্নিধানে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজাকে দংশন ও নষ্ট করিয়াছিল, তৎসমুদয় বিবরণ আনুপূর্ব্বিক কহিলেন। তচ্ছ্রবণে জনমেজয় শোকে ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধবশে বলিলেন, পিতা, পিতৃঘাতী তক্ষকের কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন যে, সে কশ্যপ নামক ওঝাকে ধন দ্বারা বশীভূত করিয়া ফিরাইয়া দিয়া, বিষজালে পিতাকে দগ্ধ করিয়াছে? তক্ষক যদি ধন দ্বারা কশ্যপকে বাধ্য না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার পিতা জীবিত থাকিতেন। রাজ-পুত্র এইরূপ

বিলাপ করিয়া, কিরূপে পিতৃঘাতী তক্ষকের বিনাশ হইতে পারে, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং মন্ত্রিগণসহ মন্ত্রণাপূর্ব্বক সর্পসত্র নামক যজ্ঞের আয়োজন ও যথাসময়ে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইত্যাদি।

ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ ও মৃত্যু সময়ে জনমেজয় এমন শিশু ছিলেন যে, কি প্রকারে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই। এই অবস্থায় শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, তাঁহার উপরে পরীক্ষিৎ রাজ-কার্য্যের অত বড় গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন, ইহা সম্ভবে কি? তাহার পর পরীক্ষিতের মৃত্যু স্বভবনে—প্রাসাদের উপরে—স্তম্ভ মধ্যে। শ্রীমদ্ভাগবতের লেখানুরূপ তিনি গঙ্গা-তীরেও যান নাই, শুকদেবকেও পান নাই এবং শুকের মুখে তাঁহার নিকটে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা আরম্ভ ও পরিসমাপ্তও হয় নাই। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের মূলসূত্র হইতে আগাগোড়া সমস্তই যে কাল্পনিক এবং এরূপ কাল্পনিক গ্রন্থ কখনও যে মহাভারতকার ব্যাসদেব কৃত হইতে পারে না, ইহা পরিষ্কার রূপে প্রমাণ হইতেছে।

বিস্তারিত বিবরণ মহাভারতে আদি পর্ব্বের চত্বারিংশ অধ্যায় হইতে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ে ও উনপঞ্চাশ অধ্যায় হইতে একপঞ্চাশ অধ্যায়ে বর্ণিত রহিয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মহাভারতের অনেক প্রসঙ্গই পুরাণে শুনিয়াছি বলিয়া বহু কথা দৃষ্টান্ত ও প্রমাণস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং মহাভারত-সৃষ্টির পূর্ব্বেও যে পুরাণ ছিল, তাহার আর ভুল-ভ্রান্তি নাই। তবে উহা গ্রন্থাকারে ছিল, কি মুখে মুখে ছিল, তদ্বিষয়ক প্রমাণ অভাব। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত সেই পুরাণশ্রেণীতে পরিগণিত হওয়ার কথা নয়; কেননা, উহা নামে-মাত্র পৃথক্, বস্তুতঃ উহাতে যে সকল প্রস্তাব উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই মহাভারত ও মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশের। গ্রন্থকার, সেই সমস্ত খাঁটি জিনিসে কতকগুলি কাল্পনিক ও অসম্ভব কথা জড়াইয়া, শ্রীমদ্ভাগবত নামে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। তাহার পর শ্রীমদ্ভাগবতের মূল উদ্দেশ্যেও লিখিত রহিয়াছে, মহাভারতাদি গ্রন্থের পরেই দেবর্ষি নারদের উপদেশ ক্রমে এই গ্রন্থ রচিত। সুতরাং মহাভারতের উল্লিখিত পুরাণ মধ্যে, শ্রীমদ্ভাগবত কদাপি স্থান পাইতে পারিতেছে না।

এই শ্রীমদ্ভাগবত মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের কৃত ত নয়ই, তাহার পর ইহা অন্য কোন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য, এই তিন জাতীয় কোন ব্যক্তিরও হস্তলিখিত বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। ইহার বিশুদ্ধ প্রমাণ ঐ গ্রন্থেই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি তিন জাতি ভিন্ন, অন্য কোন বর্ণেরই বেদ-পাঠে অধিকার ছিল না; সুতরাং বেদ এবং বেদোক্ত সন্ধ্যা-বন্দনাদি তাঁহাদিগেরই বিদিত ছিল। এই কারণেই শ্রীমদ্ভাগবতকার স্বকীয়-গ্রন্থে বেদ পরম গুহ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বেদ-অধ্যয়নে অন্য কোনও বর্ণের যে অধিকার ছিল না, ইহা মনুসংহিতা ও মহাভারতাদি পুরাণ-গ্রন্থে লিখিত আছে।

বেদ যে কিম্ভূত-কিমাকার, তাহা বোধ হয় শ্রীমদ্ভাগবতকার কোন অংশেও জ্ঞাত ছিলেন না। তাই তিনি তাঁহার গ্রন্থের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে, প্রথম বারে চারিবেদ বাহির করিয়াছেন—জাগ্রত ব্রহ্মার মুখ হইতে, অষ্টম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে দ্বিতীয় বারে উহার বহির্গমন লিখিয়াছেন—বিষ্ণুর দেহগত ছিদ্র হইতে, এই অধ্যায়েই তৃতীয় বারে উহা বহির্গত হওয়ার কথা বলিয়াছেন—

বিষ্ণুর মুখ হইতে এবং অষ্টম স্কন্ধের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে মৎস্যচরিতে, চতুর্থ বারে সেই বেদের সৃষ্টি বলিয়াছেন—নিদ্রিত ব্রহ্মার মুখ হইতে। ঘুমন্ত ব্রহ্মার মুখে জন্মিয়াই বেদ নিস্কৃতি পাইতে পারে নাই; জন্মমাত্রেই হয়গ্রীব নামে দৈত্যে উহা লইয়া চম্পট দিল। শেষে বিষ্ণু, সেই দৈত্যকে বধ করিয়া বেদের উদ্ধার করিলেন। এই সকল কথা কি বেদব্যাসের বলিয়া সম্ভবে? বেদ কি পদার্থ, উহা কে করিল এবং কিরূপে উহার উৎপত্তি হইল, তিনি কি তাহা জানিতেন না? শ্রীমদ্ভাগবতকার বেদকে কতকগুলি বহুমূল্য রত্ন বলিয়া স্থির করিয়াছেন; তাই তিনি উহা কখনও অনিদ্রিত ও নিদ্রিত অবস্থায় ব্রহ্মার মুখ হইতে বাহির হওয়ার কথা এবং কখনও বিষ্ণুর দেহগত ছিদ্র ও মুখ হইতে সৃষ্ট হওয়ার কথা বলিয়াছেন। সুতরাং এতদ্দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতকার যে বেদ কখনই দেখেন নাই, বা শুনেন নাই, তিনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের কোনও ব্যক্তি নহেন এবং বেদ অধ্যয়নে কিংবা শ্রবণে তাঁহার যে অধিকার ছিল না, তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার গ্রন্থে বর্ণিত লক্ষণে বোধ হয়, তিনি নীচজাতীয়, কি বর্ণসঙ্কর-মধ্যগত সংস্কৃতজ্ঞ কোনও পণ্ডিত ছিলেন। তবে কি উদ্দেশ্যে, কি স্বার্থে, তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবত খানি মহাত্মা ব্যাসদেবের নামে কৃত্রিম করা হইয়াছে, এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য এবং তাহাতে যে তাঁহার ষোল আনা স্বার্থ ছিল, তাহাই পাঠকদিগকে দেখান যাইতেছে।

ব্যাসকৃত মহাভারত এবং মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত, সমস্ত বিবরণই লিখিত আছে। তাহাতে জানা যায়, মনুষ্যদেহে পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতৃব্য, পিতৃস্বসা প্রভৃতি নমস্যবর্গের যেরূপ সম্মান ও অভিবাদন করা আবশ্যক, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন। কি লৌকিক, কি নৈতিক, কোন বিষয়েই তাঁহার কোন অভাব বা রীতি-ব্যতিক্রম ছিল না; ঐ দুই গ্রন্থের কৃষ্ণচরিত মহৎ হইতেও মহৎ। তিনি বাল্যে ও কিশোর বয়সে বৃন্দাবনে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা হরিবংশে এবং মথুরায় দ্বারকায় যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহাও মহাভারতে হরিবংশে বিস্তারিত রূপে রচিত হইয়াছে। মূল কথা, কথিত গ্রন্থদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের কোন কর্ম্মই লিখিতে বাকী নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রণেতা সেই সমস্ত কর্ম্মগুলি রূপান্তরে লিখিয়া, ব্যাসদেবের কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছেন এবং মহাভারতে হরিবংশে বাকী ছিল মাত্র কৃষ্ণের দুশ্চরিত্রতা; তাহাই তিনি নূতন দেখাইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বাসুদেব পবিত্রচরিত্র, সাধুগণের অগ্রগণ্য, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, সুপণ্ডিত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক, ক্ষত্রিয় বীরগণের অজেয়, অদ্বিতীয় বীর, ধর্ম্মরক্ষক, ধর্ম্ম-পোষক, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, দুষ্ট-সংহারক এবং সদাচারনিরত। এই সকল সদ্‌গুণ ও কার্য্যগত মাহাত্ম্য দর্শনেই লোকে তাঁহাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে। তদ্ভিন্ন তিনি কদাপি চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যেখানে-সেখানে উপস্থিত হন নাই, ঈশ্বররূপে অথবা ঐশ্বরিক শক্তি ক্রমেও কোন কর্ম্ম করেন নাই; যে সমস্ত মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন, সকলই মানব রূপে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন যে, তিনি যখন যে যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন, তখন সেই জাতীয় আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম সমস্তই অবলম্বন করিয়া থাকেন। রাম অবতারে পিতৃ-সত্য-পালন জন্য চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত বনবাস-জনিত অনন্ত ক্লেশ সহ্য করাই তাহার অন্যতর প্রমাণ।

শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে ইহার বিপরীত। তাহাতে ঈশ্বরত্ব প্রদর্শন জন্য কৃষ্ণ পিতৃব্য অক্রূরের ও পিতৃষ্বসা কুন্তী দেবীর প্রণাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া প্রীত হইয়াছেন; কেবল প্রণাম লওয়ায় বর্জ্জিত ছিলেন মাতাপিতার। কিন্তু তাঁহারা যে সম্পূর্ণরূপে প্রণামের দায় হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া রহিতে পারিয়াছেন, তাহাও নহে; যে প্রণামটা দেওয়া লওয়া হইয়াছে অন্তরে অন্তরে। মাতা-পিতার প্রকাশ্য প্রণামটা যদি দোষাবহ হইল, তবে পিতৃব্য পিতৃভগ্নী যে তত্তুল্য পূজ্য, তাঁহাদের প্রণামের ব্যবস্থা হইয়াছে কিরূপে? ঈশ্বরত্ব দেখানো যদি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তিনি কখনই মানব-যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিতেন না। বাসুদেবের উপরে তাঁহার পিতা-মাতার যে ভালবাসা ও স্নেহ, ব্যাসদেব মহাভারতে হরিবংশে ভক্তির উচ্চ-সীমায় তুলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতকার, তাহা একবারেই উড়াইয়া দিয়া, শুদ্ধ প্রণাম দ্বারাই শ্রেষ্ঠ ভক্তি দেখাইয়াছেন। তবে শ্রীকৃষ্ণের প্রণামটা যে তাঁহার গ্রন্থে না আছে, এমন নয়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, কৃষ্ণের যদি ঈশ্বরত্ব দেখাইয়া লোক ভুলাইবার ইচ্ছা থাকিবে, তাহা হইলে তিনি গর্ভ-নরকের অপরিসীম ক্লেশ ভোগ করিলেন কেন? বৈকুণ্ঠ হইতে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তিতে আসিয়া, গোপদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া গোপশিশুদিগের মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়া গোপ-রমণীদিগকে বাহির করিয়া লইলে কি হইত না? তিনি দেবমূর্ত্তিতে কি কুব্জার কুজ সোজা করিতে পারিতেন না? তাঁহার যদি লাম্পট্য, শঠতা, ধূর্ত্ততা, চৌর্য্য, দুশ্চরিত্রতা, লোকপীড়কতা, অত্যাচারিতা, মূর্খতা, অধার্ম্মিকতা এবং পরস্ত্রী-অপহারকতাদি অমার্জ্জনীয় বিবিধ দোষ থাকিবে, তিনি যদি কটাক্ষ-সন্ধানে বা সঙ্গীত-চাতুর্য্যে সহস্র সহস্র গোপললনাকে মোহিত করিয়া, স্বামী, গৃহ ও শিশু-সন্তান পরিত্যাগে বনগামিনী করিতেন, তবে কি বিপন্ন, অসম্মানিত গোপ-সম্প্রদায় তাহার কোনই প্রতিবিধান না করিয়া নীরবে বসিয়া থাকিত? লোক-প্রকৃতিতে, ইহা কদাপি সম্ভবপর হইতে পারে না। কথা সত্য হইলে, গোপগণ নিশ্চয়ই বাসুদেবকে তাহার প্রতিশোধ দিত, অমন দুশ্চরিত্রা কুলনাশিনী অবলাদিগের প্রাণাত্যয় ঘটাইত এবং বোধ হয়, গোপের বেটা নন্দের জীবন লইয়াও টানাটানি না করিয়া ছাড়িত না। এরূপ জঘন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত ঈশ্বর কেন, ঈশ্বরের বাবা হইলেও তাহাকে কেহ রেয়াইত করে না; নিতান্ত অপারতঃ পক্ষে আত্মপ্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়।

শ্রীকৃষ্ণের গীতে উন্মত্তা গোপাঙ্গনাগণ, স্তন্যপান-নিরত শিশুদিগকেও পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া তাঁহাদের আদরের ধন কৃষ্ণকে পাইল এবং পরিত্যক্ত শিশুগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিল। শ্রীমদ্ভাগবত-কার তাঁহার গ্রন্থে এখানি লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু অতঃপর মাতৃহীন শিশুদিগের কি দশা ঘটিল, তাহারা জীবিত রহিল, না মাতৃবিরহে মরিয়া গেল; গৃহশূন্য গোপদিগের অবস্থাই বা কিরূপ দাঁড়াইল, তাহারা ঐরূপ অসহ্য দুঃখে ও কষ্টে মাথা কুটিতে কুটিতে শিশুদের সঙ্গে সঙ্গে মরিল, কি লাঠি লইয়া প্রতীকারের চেষ্টা পাইল, না জন্মের মত স্ব স্ব পত্নীদিগকে উৎসর্গ

করিয়া দিল ; তাহার তিনি কোন কথাতেই হাত দেন নাই, কোন কথারই কিছু কিনারা করিয়া লিখেন নাই। তাঁহার যে পর্য্যন্ত স্বার্থ, সেই পর্য্যন্তই রচনা। সুতরাং এমন স্বার্থপর রচকের রচনা কোনও ক্রমে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। অতএব এই সকল অপবাদ-কাহিনী নিতান্ত অলীক ও অপ্রাসঙ্গিক। ভগবানের পবিত্র চরিত্রে এই অমূলক কলঙ্ক-বিবরণ পাঠ, শ্রবণ বা বিশ্বাস করিলেও নিশ্চয় তাহাকে মহাপাতকে পতিত হইতে হইবে।

অক্রূর আসিয়া যেই বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখনই মথুরায় গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি কুব্জার কুঁজ সোজা করিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলদেবের সমক্ষেই তাহার সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে মত্ত হইলেন, তৎপরে তাহার অনুমতি-গ্রহণে ঘর হইতে বাহির হইয়া পিতৃ-ভবনের নিকটে যাইয়াই আবার পুরনারীদিগের প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিলেন ; তাহাতে সমস্ত পুরনারী মোহিত হইয়া পড়িল। যে লজ্জা মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ মহৎ গুণ বলিয়া ব্যাখ্যাত, যাহার অভাবে লোক পাগল, শিশু অথবা মাদকাসক্ত (নেশাখোর) বলিয়া উপহসিত হয় এবং যাহার কল্যাণে মনুষ্য-সমাজ পরিরক্ষিত হইতেছে, কৃষ্ণের মত একজন উন্নতচেতাঃ বীরপুরুষ, সেই লজ্জাকে তৃণবৎ উড়াইয়া দিয়া, গুরুজন বলদেবের সাক্ষাতেই কুব্জাতে উপগত হইলেন ও পুরনারীদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন ! লাজের মাথা খাইয়া শ্রীমদ্ভাগবতকার কোন্ প্রাণে এমন অন্যায়, অসঙ্গত, অসম্ভব কথাগুলি লিখিলেন ? অনেকদিন পরে কৃষ্ণ বলরাম দর্শনজন্য যখন পুরনারীরা বাহির হইয়াছিল, তখন কি তাহার মধ্যে কৃষ্ণের ভগ্নী, মাতুলানী, পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতি কোন গুরুলোক ছিলেন না ? বিশেষতঃ নিগড়-নিবদ্ধ মাতাপিতার উদ্ধার-বাসনায় দুষ্ট দুর্ম্মতি কংসবিনাশ জন্য যিনি মথুরায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার কি এই কুব্যবহার সম্ভবে ?

কৃষ্ণ-বলরাম যাইতে যাইতে পথিমধ্যে দেখিলেন, কংসের ভৃত্য রজক, তাঁহার পুরাতন বস্ত্রগুলি ধৌত করিয়া রাজভবনে লইয়া যাইতেছে। তখনই তাঁহাদের লোভ জন্মিল ; রজক সহজে বস্ত্র না দেওয়াতে, কৃষ্ণ নিজে তাহাকে হত্যা করিয়া দুই ভাইয়ে বস্ত্র পরিধান করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত-লেখক যাঁহাকে শত শত স্থানে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং যে বিশ্বরূপের কোন বস্তুরই অভাব সম্ভবে না, সেই শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাই আবার লোভবশে উৎসৃষ্ট

পুরাতন বস্ত্র গ্রহণ ও নিরপরাধে একটী প্রাণী বধ করাইলেন ? তাঁহার এ লিপি-বৈচিত্র্য বস্তুতঃ বিস্ময়কর।

শ্রীমদ্ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণের উপর গুরুতর দোষ চাপাইয়া দিয়া, তাঁহার নাম দিয়াছেন কোথাও আত্মারাম, কোথাও রমানাথ, কোথাও জগৎস্বামী। আত্মরূপী নারায়ণ, এই বলিয়া যদি তিনি তাঁহাকে আত্মারাম লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে আত্মরূপী ঈশ্বর আর পিতা, একই কথা। তবে তাঁহার কলমে কেমন করিয়া লিখিত হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপরমণীদিগকে দেখিয়া আত্মভোগে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে, ইতর-জনোচিত মনোমুগ্ধকারী সঙ্গীতে টান দিলেন। তন্মুহূর্ত্তেই গোপীরা সেই গানে উন্মত্ত হইয়া, কৃষ্ণকে বাবা না কহিয়া, আত্মারাম নামে সম্বোধন করিল !

মহাভারতে হরিবংশে, শ্রীকৃষ্ণ যে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ, ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে যদিও উহা সোজাসুজি ভাবে লিখিত না থাকুক, তবুও গ্রন্থকার যখন শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, তখনই তাঁহাকে ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং তিনি যে ক্ষত্রিয়, তাঁহার মাতাপিতা যে কংসের অত্যাচারে কারারুদ্ধ ছিলেন, তাঁহাকে যে অনতিবিলম্বেই বৃন্দাবন পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতৃভবনে যাইতে হইবে এবং উপনীত হইয়া পত্নী গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অবশ্যই তিনি জানিতেন, মাতাপিতার গুরুতর কষ্টের কথাও অবশ্যই মনে করিতেন। তাহার পর গোপ-রমণীরা যে গোপদিগের উৎসৃষ্ট, তাঁহার সৃষ্টিতে যে তদপেক্ষা সহস্রগুণে সুন্দরী স্ত্রীর অভাব ছিল না, অথবা সৃষ্টি করিয়া লইতেও তিনি অক্ষম ছিলেন না, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের অবগতি ছিল। এ অবস্থায় তিনি মুহূর্ত্তের জন্য জ্ঞানান্ধ হইয়া অতবড় দুষ্কার্য্য ও দস্যুতা করিয়াছিলেন, ইহা একান্ত অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ কি নৈতিক উদ্দেশ্যে গোপীদিগকে ঘরের বাহির করিয়া, পরে ঝোড়ে জঙ্গলে ফেলিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন ? গোপীরা তাঁহার কি অনিষ্ট করিয়াছিল ? তবে কদাচিৎ কোনও নরপশু সুন্দরী রমণী দর্শনমাত্র হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া মুহূর্ত্তের তরে কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটাইয়া বসে বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মত উচ্চবংশীয় জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যে সেইরূপ ইতর-জনোচিত কুকর্ম্মে ডুবিয়াছিলেন, এ কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ কখনই আত্মগোপন করেন নাই; তিনি নিজ মুখেই নিজের ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যখন ঈশ্বর, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে, গোপগণ তাঁহার পুত্র, গোপাঙ্গনাগণ তাঁহার পুত্রবধূ অথবা কন্যা। এরূপ অবস্থায় তিনি যে গোপরমণীদিগকে ভুলাইয়া উপপত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা কিসে বিশ্বাস করা যায়? গ্রন্থকার ভগবান্‌কে আত্মারাম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আত্মা হইলেই আপনা হইল। সুতরাং তাঁহাতে আর গোপগণেতে ভেদ ছিল না। এই অসংলগ্ন অর্থে যদি তিনি গোপরমণী-দিগকে উপপত্নী করিতে পারেন, তবে অন্য কোন লোকে পারিবে না কেন? সকল জীবেই ত আত্মা আছে;—আত্মার ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণ যদি আত্মার মুলীভূত, তাহা হইলে তিনি আত্মাধিক ঈশ্বর—পরমাত্মা। তিনি অবশ্যই জগৎ-পিতা, ধর্ম্মরক্ষক, ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং দুষ্টসংহার করিয়া ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিবার জন্যই মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার যদি এই প্রকার দস্যু-ব্যবহার ও দুশ্চরিত্রতা থাকিবে, তাহা হইলে তিনি অত্যাচারী, লোকপীড়ক অনন্ত দস্যু এবং রাক্ষসরাজ দুষ্ট রাবণকে বধ করিবেন কেন? কৃষ্ণরূপে না হইয়া থাকিলেও ত রাবণ রামরূপে তাঁহারই হাতে নিহত হইয়াছে! শ্রীকৃষ্ণ লোকপীড়ক দস্যু, না বৃন্দাবনে কংস-প্রেরিত দৈত্যগণ দস্যু? দৈত্যগণ লোকদিগের উচ্ছেদ সাধন করেন নাই, গোপ ও গোপ-শিশুদিগের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন কি শ্রীকৃষ্ণ? এই কথা কি প্রকৃত? তিনি যে গোপদিগকে আশ্রয় করিয়া, যে গোপদিগের যত্নে শৈশব অবস্থা হইতে কৈশোর অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, সেই গোপদিগের সর্ব্বনাশ করিলেন, তাহাদের কুলে কালী দিলেন; শ্রীকৃষ্ণ কি তবে কৃতঘ্ন, না দস্যু ছিলেন? তাঁহার ব্যবহার এবম্ভূত হইলে, তাঁহাকে দস্যু অপেক্ষা দস্যু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গোপীদিগের প্রতি যদি কৃষ্ণের মত্ততা এবং লোভই থাকিত, তবে অক্রূর বৃন্দাবনে আসিয়া সংবাদ দেওয়া মাত্র তিনি মথুরায় চলিয়া যাইতে পারিতেন না, বৃন্দাবনে ফিরিয়া না আসিয়া সেখানে থাকিতেও পারিতেন না। গ্রন্থকার গোপীগণের আত্মার সহিত আত্মারামের যেরূপ নিগূঢ় বন্ধন দেখাইয়াছেন, অচিরাৎ সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়া মথুরায় যাওয়া একান্ত অসম্ভব। ততোধিক অসম্ভব, বৃন্দাবনে সহস্র সহস্র প্রণয়িনীকে বনে জঙ্গলে ফেলিয়া, কৃষ্ণ যে মুহূর্ত্তে মথুরায়

গেলেন, তখনই আবার কুব্জা নামে আর একটা জঘন্য স্ত্রীকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। ইহা অস্বাভাবিক নয় কি ? ইহাতেও তাঁহার আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হইল না ; তিনি রাজবাড়ীর রমণীদিগের উপর কটাক্ষ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি এখান হইতে দ্বারকায় গমন করিলেন। একদিন দেবর্ষি নারদ, সেখানেও যাইয়া দেখেন যে, কৃষ্ণ ষোল হাজার পত্নীতে, ষোল হাজার গৃহে, ষোল হাজার রূপ ধারণ করিয়া বিহার করিতেছেন ; এতদরিক্ত কতকগুলি বার-নারীও তাঁহার কেলি-কলাপের বিষয়ীভূত হইয়াছে। বাস্তবিক এতদ্দ্বারা কৃষ্ণকে যে পরিমাণে ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ও লম্পটরূপে দেখান হইয়াছে, সেই পরিমাণে কিন্তু তাঁহার নির্ম্মল যশ বর্ণিত হয় নাই। এক কৃষ্ণ যে হাজার হাজার, অযুত অযুত, লক্ষ লক্ষ, কৃষ্ণ হইতে পারিতেন, ইহা নারদমুনি জানিতেন, নারদমুনি যে ইচ্ছা করিলে সহস্র সহস্র নারদরূপ-ধারণে সক্ষম ছিলেন, তাহাও কৃষ্ণের অনবগত ছিল না। পুরাকালের যে সমস্ত দৈত্য ও রাক্ষসের কাহিনী আছে, তাহাতেও, তাহারা মায়াবলে একজনেই স্বমূর্ত্তিতে বহুরূপ ধারণ করিতে পারিত বলিয়া জানা যায়। কৃত্তিবাস-বিরচিত রামায়ণে লিখিত আছে, রাক্ষসরাজ রাবণ, বালিতনয় অঙ্গদ-বীরকে শত শত রাবণমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। সুতরাং ঐরূপ মায়ামূর্ত্তি প্রদর্শন সে সময়ে কোন প্রশংসার কর্ম্মই হইত না। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র চরিত্রে রাশি রাশি কলঙ্ক ঢালিয়া দিয়া, সেই কর্ম্মগুলিই আবার দোষাবহ নয়, বলিয়া, মায়ামূর্ত্তি ও বিশ্বরূপ সাজাইয়া স্তব করাতে যে, ভগবান্ প্রীত হইলেন, কখনই এরূপ নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ স্বভাবে কার্য্যতঃ দুশ্চরিত্রতা ও দস্যুতা কল্পনা করিয়া, তাঁহার নাম দিয়াছেন জগৎস্বামী এবং ব্যক্ত করিয়াছেন জগতে যত রমণী আছে, রমানাথ সকলেরই স্বামী ; সুতরাং তাঁহার সংসর্গ অবৈধ নহে। যদি জগৎস্বামী নামের এই অর্থ ই প্রকৃত হইত, তাহা হইলে শঙ্খাসুরের স্ত্রীর সতীত্ব ধ্বংস হইল কিরূপে ? সুতরাং জগৎস্বামী নামের অর্থ জগতের পালনকর্ত্তা, স্রষ্টা, জগতের শান্তিরক্ষক, ধর্ম্মরক্ষক। জগৎস্বামী নামে গ্রন্থকারের স্বার্থ, সম্প্রদায় গঠন করা, শ্রীকৃষ্ণকে কোটি কোটি পরস্ত্রীতে আসক্ত দেখানো। সেই সম্প্রদায়ের শান্তিসুখের নিমিত্ত, আবার এই সূত্রে

কেহ দোষ কীর্ত্তন করিতে না পারে, তজ্জন্য তাঁহার নাম করা আবশ্যক হইয়াছে—আত্মারাম, জগৎস্বামী এবং রমানাথ। তদন্যথায় তাঁহার নৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দোষ-চরিত্রে ঘোরতর কলঙ্ক রচনা দ্বারা আদর্শরূপ ভিত্তি স্থাপন করিলে, সম্প্রদায়-গঠনের গুরুগিরিতে পসার বাঁধিয়া লওয়ার উত্তম সুবিধা চিন্তা করিয়াই বোধ হয় ব্যাসদেবের নামে এই গ্রন্থ করা হইয়াছে। কৃষ্ণ-চরিতের অনুকরণে গঠিত-সম্প্রদায় হিন্দুগণের মধ্যে সাদরে গৃহীত হইবে, ইহাই ছিল শ্রীমদ্ভাগবতকারের উদ্দেশ্য ; তাহাই সফল হইয়াছে। সুতরাং গ্রন্থকারের কল্পনা-সম্ভূত কলঙ্কিত কৃষ্ণ-চরিতানুকরণে যে সম্প্রদায় হিন্দুদিগের মধ্যে বিদ্যমান আছে, তাহারাই পূর্ব্বে গ্রন্থকারের শিষ্য পসার ছিল, তাহাদের হিতার্থে এবং তাঁহার উত্তরোত্তর সুযোগ-সুবিধার জন্য তিনি ওরূপ অসঙ্গত লেখনী চালনে ব্রতী হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যদি সহস্র সহস্র গোপাঙ্গনার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অবৈধ সংসর্গের ছড়াছড়ি না থাকিত, তাহা হইলে বৈরাগী-সম্প্রদায় কখনও গৃহস্থাশ্রম হইতে শত শত স্ত্রীলোক বাহির করিয়া লইয়া, বৈরাগিণী নামে উপপত্নীরূপে প্রকাশ্যে ব্যবহার করিতে পারিত না ; শ্রীমদ্ভাগবতে যদি শ্রীকৃষ্ণের রাসবিহার, কুব্জাগ্রহণ না থাকিত, তবে বৈরাগীরাও তাঁহার অনুকরণে শত শত বৈরাগিণী রাখিতে পারিত না এবং শ্রীমদ্ভাগবতে যদি শ্রীকৃষ্ণের সেই সহস্র সহস্র গোপীদিগের সংসর্গে জাত জারজ-সন্তানের কথা লেখা থাকিত, তাহা হইলে বৈরাগী-সম্প্রদায়ের গুরু-মহাত্মারা, তাহাদের জারজ-সন্তানসহ অচল থাকিবে, এই ব্যবস্থা বাহির করিয়া দিয়া, লক্ষ লক্ষ বৈরাগী-বৈরাগিণীকে নিঃসন্তানাবস্থায় রাখিতে ও তাহাদের অভাবে ত্যক্তসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে কখনই সুবিধা পাইতেন না। কাজেই বলিতে হইবে যে, সর্ব্বাবয়বে, সমস্ত লক্ষণে আধুনিক বৈরাগী-সম্প্রদায়-গঠন, হিন্দুদলের মধ্যে তাহাদের সাদরে গ্রহণ, উহাদের শান্তিসুখ এবং ইহাই দেখাইয়া ক্রমশঃ সম্প্রদায় বৃদ্ধি করার নৈতিক উদ্দেশ্যে, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বালক বয়সের সময় তাঁহার উপর অপ্রাসঙ্গিকরূপে ঘোরতর কলঙ্ক চাপাইয়া, বৈরাগী-সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা সংস্থাপন করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে যদি কৃষ্ণের লক্ষ লক্ষ উপপত্নী গ্রহণের কথা না থাকিত,

তাহা হইলে কি খৃষ্টান-পাদ্রীরা আমাদের ঈশ্বর কৃষ্ণ-চরিত্রের দোষ কীর্ত্তন-পূর্ব্বক স্থানে স্থানে বক্তৃতা-প্রদানে হিন্দু-সন্তানদিগকে খৃষ্টান করিতে পারিতেন ? পুনরপি বলি, ভগবানের কুৎসা বা কলঙ্ক, পাঠ, শ্রবণ অথবা মনে চিন্তা করিলেও মহাপাতক জন্মে, সেই গুরুতর পাতক হইতে কাহারও নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। অতএব এ বিষয়ে সকলেরই সাবধান থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, এই তিনটী লোক নিতান্ত ধর্ম্ম-পরায়ণ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি ধর্ম্মরক্ষক হইবেন, তাহা হইলে রণক্ষেত্রে অন্যকে ছল, প্রতারণা ও মিথ্যা কথা বলিতে প্রবৃত্তি দিয়া ঐ তিনটী ধার্ম্মিক লোকের, বিশেষতঃ দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণের প্রাণ অন্যায়রূপে ও অধর্ম্মাচরণে বধ করাইলেন কেন? সুতরাং কখনই শ্রীকৃষ্ণকে ধর্ম্মরক্ষক বা ধর্ম্মপালক বলা যাইতে পারে না।

এই সম্বন্ধে বিচার করা আবশ্যক হইলে, আদ্যন্ত সমস্ত কথার আলোচনা না করিয়া ঐ ব্যক্তি তিনটীকে কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে ধার্ম্মিকরূপে দেখিলেই কি সুবিচার হইতে পারে? দেখিতে হয়, কুরুপাণ্ডবদিগের বিবাদ কি নিমিত্ত? যে রাজত্ব লইয়া বিবাদ, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই রাজ্য কাহার? উহার মূল মালিক ছিলেন বিচিত্রবীর্য্য। তিনি অকালে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার দুই স্ত্রীর গর্ভে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে পরাশরনন্দন ব্যাসদেব দুইটী পুত্র উৎপাদন করেন। তাহার একের নাম পাণ্ডু, অন্যটীর নাম ধৃতরাষ্ট্র। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে জন্মান্ধতা নিবন্ধন ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত হওয়াতে, পাণ্ডুই সমগ্র পৈতৃক রাজ্যের অধিকারী হন এবং সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া বসেন। বহুকাল রাজ্য-ভোগের পর রাজা পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে, শাস্ত্রমতে তাঁহার পুত্র যুধিষ্ঠিরাদিতেই সম্পত্তির অধিকারিত্ব পঁহুছে। কিন্তু ঘটনা বশতঃ তাঁহাদের ভাগ্যে সহজে সে সুখ ঘটিয়া উঠিল না। যে ভীষ্ম উভয় পক্ষেরই পিতামহ, বহুকাল পর্য্যন্ত পাণ্ডু-রাজের অন্নেই যাঁহার শরীর পুষ্ট, তাঁহাকে সহায়বল অবলম্বন করিয়া, ধৃতরাষ্ট্র ও তৎপুত্র দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির-প্রভৃতিকে প্রাণে বধ করার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা পান। তাঁহারা তাঁহাদিগকে কৌশলক্রমে বনে পাঠান, এবং সেখানে পাণ্ডুরাজার পরিত্যক্ত ধন দ্বারাই জতুগৃহ প্রস্তুত করাইয়া চতুরতা পূর্ব্বক পুড়াইয়া মারিতে উদ্যোগী হন। ন্যায়ানুসারে যত্নচেষ্টা করিলে কিন্তু ভীষ্ম অবাধে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন।

তিনি তাহা না করিয়া পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বী হওয়াতে, দুর্য্যোধন কণিকসূত্র অবলম্বনে তাঁহাদের প্রাণ-নাশে যথোচিত চেষ্টা পাইলেন। অবশেষে তাঁহারা যদিও ইন্দ্রপ্রস্থে স্বতন্ত্র বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাস করিতেছিলেন, তাহাতেও তাঁহাদের অদৃষ্টে সুখ হইল না। দুর্ব্বুদ্ধি, লোভী, হিংসক দুর্য্যোধন পাশাখেলায় পরাজিত করিয়া পাণ্ডবদিগের ধর্ম্ম-পত্নী দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন পূর্ব্বক যত কিছু অসম্মান করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণের অনুবলে। যুদ্ধক্ষেত্রেও ভীষ্ম দুষ্ট দুর্য্যোধনেরই সেনাপতি হইয়া প্রতিদিন দশ হাজার লোকের ও অশ্ব হস্তী আদি অগণিত পশুর প্রাণ সংহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ইহাঁরা তিনজনে প্রতিকূলাচারী হইয়া পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের সহায়তা না করিলে, কদাপি পুঞ্জে পুঞ্জে অত লোকক্ষয় হইত না, এবং যুধিষ্ঠিরাদির রাজ্যলাভেও কোন বিঘ্ন ঘটিত না।

ধর্ম্মশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া অধর্ম্মাচরণে, ঐ তিন ব্যক্তি দুষ্ট-দস্যু দুর্য্যোধনকে রাজত্ব দিলেন এবং লোকক্ষয়মানসে পৃথিবী জনশূন্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা ভগবানের চক্ষে নিদারুণ কষ্টের কারণ হইল। তিনি যখন দেখিলেন যে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের সহায়তাতেই দুষ্ট দুর্য্যোধন বলিষ্ঠ হইয়া ন্যায্য প্রাপক পাণ্ডবদিগকে রাজ্যলাভে বঞ্চিত করিতেছেন, তাঁহারা সাহায্যকারী না হইলে, দুর্য্যোধন কখনই অন্যায় পূর্ব্বক পরসম্পত্তি হস্তগত করিয়া দস্যুতায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না এবং ভারতবর্ষও জনপ্রাণিশূন্য হইত না, তখনই ইহাঁদের বধের উপায় উদ্ভাবন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহার মনে হইল ; তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করাইলেন। জগতে নিজে দুষ্ট, দস্যু, অধার্ম্মিক, পরধন-পরসম্পত্তি-অপহারক হওয়াও যে কথা, ঐরূপ প্রকৃতিমান্ লোকের সহায়তা করাও ঠিক সেই কথা ; উভয়তই তুল্য পাপ। সুতরাং দুষ্ট দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক যে সকল গুরুতর পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সমস্ত কর্ম্মের পরিপোষকরূপী ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণও যে উপেক্ষিতব্য নয়, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই পাপেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সংহার করাইয়া, ন্যায়ানুসারে যাঁহাদের পৈতৃক রাজ্য, তাহা তাঁহাদিগকে দিয়াছেন, তাহাতে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন এবং প্রাণিক্ষয় নিবারণ করিয়াছেন। সুতরাং এই লোকহিতকর কার্য্যে ভগবান্‌কে ধার্ম্মিক,

ধর্ম্মরক্ষক ও ধর্ম্মপোষক বলা অবশ্য কর্ত্তব্য। সিংহ ব্যাঘ্রাদি জাতীয় একটী মাত্র হিংস্র জন্তুর বিনাশে যেমন অনন্ত প্রাণীর প্রাণ রক্ষা হয়, ভীষ্মাদিবধেও ভগবান্ সেই ফল ফলাইয়াছেন, তাঁহাদের পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। এ কর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণের অপরিসীম যশঃ ও পুণ্য ভিন্ন, কখনই পাতক হইয়াছে বলিয়া মনে স্থান দেওয়া সঙ্গত নহে।

সম্পূর্ণ।